উচ্চতর বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

এইচএসসি প্রোগ্রাম

কোর্স কোড : **HSC- 2808**

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চতর বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

এইচএসসি প্রোগ্রাম

রচনা

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান
ড. দিলারা হাফিজ

সম্পাদনা ও রচনাশৈলী নির্দেশনা

মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান

কোর্স সমন্বয়কারী

মোঃ চেঙ্গীশ খান

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চতর বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

এইচএসসি প্রোগ্রাম

বিষয় কোড- ২৮০৮

ওপেন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর- ১৭০৫

কম্পিউটার কম্পোজ এবং ডেস্কটপ প্রসেসিং
মোঃ টিপু সুলতান

প্রকাশ কাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৩
পুন:মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৫

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর- ১৭০৫

© ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিক্স
আব্দুল মালেক

মুদ্রণ
বুকম্যান প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৪ লারমিনি স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা

ISBN 984-34-3040-9

সূচিপত্র

বিষয়	**পৃষ্ঠা**
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ আধুনিক যুগ	১
ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত ঃ কাজী নজরুল ইসলাম	৫৬
ছন্দ ও অলঙ্কার	৭৮

নমুনা প্রশ্ন

উচ্চতর বাংলা
দ্বিতীয় পত্র
কোর্স কোড ঃ HSC-2808
সময়- ৩ ঘণ্টা
পূর্ণমান- ১০০

[**দ্রষ্টব্য** ঃ- ডান পার্শ্বে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলতি ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

নম্বর

১। যে-কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ- ১৮×২=৩৬
(ক) বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।
(খ) বাংলা গদ্য চর্চায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান কতটুকু আলোচনা করুন।
(গ) আধুনিক বাংলা কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদানের মূল্যায়ন করুন।
(ঘ) বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
(ঙ) কবি হিসেবে ঈশ্বরগুপ্তের মূল্যায়ন করুন।

২। যে-কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ- ৭×২=১৪
(ক) রাজা রামমোহন রায়ের পরিচয় দিন। বাংলা ভাষার লেখক হিসাবে তাঁর পরিচয় দিন।
(খ) অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে লিখুন।
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কেন?
(ঘ) মুসলিম সাহিত্য সমাজের পরিচিতি লিখুন।
(ঙ) কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখুন।

৩। যে-কোন **দুইটি** টীকা লিখুন ঃ- ১০×২=২০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কৃষ্ণকুমারী নাটক, সূর্যদীঘল বাড়ী, পর্তুগীজ মিশনারী, উইলিয়াম কেরী।

৪। যে-কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ- ১৫
(ক) ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন ও তাঁর রুবাই-এর পরিচিতিমূলক একটি নিবন্ধ রচনা করুন।
(খ) ওমর খৈয়ামের রুবাই-এর অনুবাদক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করুন।
(গ) বাংলা সাহিত্যে ফারসি রুবাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে কেন?

৫। যে-কোন **একটির** ব্যাখ্যা লিখুন ঃ- ৫
(ক) তারা যেন দেখতে বলে উজল প্রাতের আরশিতে—
ছন্নছাড়া তোর জীবনের কাটল কেমন একটি রাত!
(খ) "ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস?" কইল ঋষি স্বপ্নে মোর,
আনন্দ গুল প্রস্ফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর?
(গ) তুইই মানুষ, তুইই পশু, দেবতা দানব স্বর্গদূত,
যথত হতে চাইবি রে যা হতে পারিস তুই তা যে।

৬। যে-কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ- ১০
(ক) ধ্বনি ও অক্ষর-এর সংজ্ঞার্থ লিখুন।
(খ) অলঙ্কার বলতে কি বোঝায়? উদাহরণসহ লিখুন।
(গ) অনুপ্রাস কি? উদাহরণসহ লিখুন।

মানবন্টন

উচ্চতর বাংলা
দ্বিতীয় পত্র
কোর্স কোড ঃ HSC- 2808

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৭০

(১) ৫টি বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর দিতে হবে।	১৮×২=৩৬
(২) ৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর দিতে হবে।	৭×২=১৪
(৩) ৫টি টীকা থাকবে, ২টির উত্তর লিখতে হবে।	১০×২=২০
	৭০

বিশ্বসাহিত্য ২০

(১) ৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে।	১৫×১=১৫
(২) ৩টি উদ্ধৃতি দেয়া থাকবে, ১টির ব্যাখ্যা করতে হবে।	৫×১=০৫

ছন্দ ও অলঙ্কার ১০

ছন্দ ও অলঙ্কার সম্পর্কে ৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০×১=১০

h¡wm¡ p¡¢q-aÉl C¢aq¡p

(B d¤¢e L k¤N)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ

উনিশ শতকে বাংলা গদ্য চর্চা আধুনিক সাহিত্যবোধ ও নাগরিক রুচি বিকাশে সহায়তা করেছে। আধুনিক কালের পূর্বে বাংলা গদ্যের ব্যবহার যে ছিল না, তা নয়। তবে তা ছিল খুব সামান্যই। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই হিসাব-নিকাশ, চুক্তিপত্র, চিঠিপত্র ইত্যাদি রচনায় খুব সামান্য পরিসরে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ গদ্য অবিকশিত। তখনও গদ্যে কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের ততটা প্রয়োজনও অনুভব করা হয়নি। তাছাড়া বাংলা কাব্যের পয়ার - ত্রিপদীতেই কবিরা চিন্তামূলক বিষয় - এমন কি জীবনী ও লিখেছেন। ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের সামান্য নমুনা আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণের পত্রটির ভাষা এরকম-

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" (দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" পৃ ১৬৭২)। সম্পূর্ন জড়তামুক্ত না হলেও এ পত্রের ভাষা সহজ। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও কিছু চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজে বাংলা ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের ধর্মতত্ত্ববিষয়ক 'কড়চা' জাতীয় রচনাতেও গদ্য রচনার ব্যবহার দেখা যায়। তখনও সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেনি গদ্য। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া গদ্যের ব্যবহার তখন দেখা যায়নি।

এ প্রসঙ্গে পর্তুগীজ মিশনারীদের গদ্যচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতেই পর্তুগীজরা বাংলাদেশে আসে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই তারা বাংলা ভাষা শেখে ও গদ্য গ্রন্থ রচনা করে। মানো এল দা আসসুম্পসাঁও নামে একজন পর্তুগীজ পাদরি দুটি বই রচনা করেন। বই দুটি হচ্ছে- ক) Vocabularioem Idioma Bengalla & Poratuguez নামে একটি পর্তুগীজ বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ এবং খ) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। দ্বিতীয় বইটিতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বই দুটি আঠার শতকের প্রথমার্ধে রোমান হরফে পর্তুগালের লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়। তখনও বাংলা হরফে মুদ্রণের ব্যবস্থা না থাকায় বই দুটি রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। দোম আন্তোনিও দো রোজারিও নামক আর একজন পাদরি "ব্রাহ্মণ - রোমান - ক্যাথলিক সংবাদ" নামে আরেকটি বাংলা পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়নি বলে জানা যায়। পর্তুগীজদের

রচনাবলী দেখে জানা যায় তারা সেকালে বাংলায় মোটামুটি ভাল দক্ষতা অর্জন করেছিল। পর্তুগীজদের আরেকটি বড় অবদান তাদের দ্বারাই বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লিখিত হয়েছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেশের শাসনভার গ্রহণ করেই কোম্পানীর কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শেখার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। কোম্পানীর হ্যালহেড নামে একজন কর্মচারী বাংলা ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন। তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য ইংরেজি ভাষায় A grammar of the Bengali language, (1778) রচনা করেন। এতে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। হ্যালহেড সাহেব তাঁর বন্ধু চার্লস উইলকিনস ও পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় ছাপাখানার জন্য বাংলা হরফ তৈরি করেন। আঠার শতকের শেষের দিকে জোনাথান ডানকান, নীল বেঞ্জামিন প্রমুখ পন্ডিত বাংলা গদ্যে ইংরেজি আইনের অনুবাদ করেন। কিন্তু এ অনুবাদগুলি মোটেও প্রাঞ্জল ছিল না। এগুলো একদিকে ছিল জড়তাপূর্ণ ও অন্যদিকে ছিল হাস্যকর। এ সময়ে কোম্পানীর আরও কিছু কর্মচারী প্রয়োজনের তাগিদে শব্দকোষ ও অভিধান জাতীয় বই রচনা করেন।

শ্রীরামপুর মিশন- শ্রীরামপুর মিশন এ খ্রিস্টানধর্ম প্রচারের একটি প্রতিষ্ঠান হলেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাংলা গদ্য সাহিত্য যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে টমাস ও ইউলিয়াম কেরী নামে দুজন মিশনারী বাংলাদেশে আসেন। আরও কয়েকজন সহযোগীর সাহায্যে কেরী শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। সেকালে কোম্পানীর কর্মচারীরা মিশনারীদের কাজকর্ম খুব ভাল চোখে দেখতেন না। সেজন্য কলকাতার অদূরে দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে কেরী মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কেরী একটি ছাপাখানা বসাতে সক্ষম হন। এই ছাপাখানায় ভারতের নানা ভাষায় বাইবেল অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত এ মিশনটি সক্রিয় ছিল।

কেরী ও তাঁর কিছু সহযোগী ভালভাবে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। এখান থেকে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বাইবেল “ধর্মপুস্তক” নামে প্রকাশিত হয়। কেরীর বাইবেলের ভাষা কৃত্রিম ও জড়তাযুক্ত। তবে এ মিশন থেকে বহুসংখ্যক বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাল্মিকী রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত এই মিশন থেকেই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। না অথবা হ্যা লিখুন।

ক) আধুনিক কালের পুর্বে বাংলা গদ্যের অস্তিত্ব ছিল?

উত্তর ঃ ... ...

খ) মধ্যযুগে বাংলা গদ্যে কোন সাহিত্য রচিত হয়নি।

উত্তর ঃ ... ...

গ) মধ্যযুগের কিছু চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গেছে।

উত্তর ঃ ... ...

ঘ) বৈষ্ণব সহজিয়ারা কড়চা রচনা করেছেন।

উত্তর ঃ ... ...

ঙ) ভ্রমণ করার জন্য পর্তুগীজরা বাংলায় গিয়েছিল।

উত্তর ঃ ... ...

চ) ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ একজন পর্তুগীজ পাদরি রচনা করেন।

উত্তর ঃ ... ...

ছ) ‘A grammar of the Bengali language` কে রচনা করেন, জানা যায়নি।

উত্তর ঃ ... ...

জ) টমাস ও উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তর ঃ ... ...

ঝ) কেরীর বাইবেলের ভাষা প্রাঞ্জল।

উত্তর ঃ ... ...

ঞ) কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রথম শ্রীরামপুর মিশন থেকে মুদ্রিত হয়।

উত্তর ঃ ... ...

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মধ্যযুগে বাংলা গদ্য ছিল চিঠিপত্র ও … … … … … … … … … … … ভাষা।

খ) চিন্তামূলক বিষয়ও কবিরা মধ্যযুগে পয়ার ও … … … … … … … … … … … লিখেছেন।

গ) … … … … … … … … … … … … শতাব্দীতেই পর্তুগীজ মিশনারীরা এদেশে আসে।

ঘ) মানো এলদা … … … … … … … … … … … … দুটি বই রচনা করেন।

ঙ) বাংলা হরফ না থাকায় সেকালে … … … … … … … … … … … … হরফে বই মুদ্রিত হয়েছে।

চ) … … … … … … … … … … … … ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ রচনা করেন।

ছ) পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলা ভাষায় … … … … … … … … … … … ছিলেন।

জ) … … … … … ও … … … … … …, পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় বাংলা ছাপার জন্য প্রথম হরফ তৈরি করেন।

ঝ) সেকালে কোম্পানীর লোকেরা … … … … … … … … … … … কর্মকান্ড খুব ভাল চোখে দেখিত না।

ঞ) … … … … … … … … … ও কাশীরাম দাসের মহাভারত শ্রীরামপুর মিশন থেকেই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

১। ক) হ্যা খ) না গ) হ্যা ঘ) হ্যা ঙ) না চ) হ্যা ছ) না জ) হ্যা ঝ) না ঞ) হ্যা

২। দলিল-দস্তাবেজের খ) ত্রিপদীতে ঘ) ষোড়শ ঘ) আসসুম্পসাম ঙ) রোমান হরফে চ) দোম আন্তোনিও দো রোজারিও ছ) দক্ষ জ) হ্যালহেড, চার্লস উইলকিনস ঝ) মিশনারীদের ঞ) কৃত্তিবাসী রামায়ণ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

সদ্য বিলাত থেকে আগত তরুণ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ় করাই ছিল এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। তবে শাসকদের দৃষ্টির অন্তরালে এ প্রতিষ্ঠান ভাষা ও সাহিত্য চর্চার, ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় এবং এ কলেজের দায়িত্ব দেওয়া হয় মিশনারী উইলিয়াম কেরীকে। উইলিয়াম কেরী এ দেশে এসেছিলেন খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। পাদরি টমাসের সহযোগিতায় কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুরে তিনি একটি মিশন গড়ে তোলেন। তবে এরও আগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে তিনি ভারতীয় বেশ কটি ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করেই কেরী বাংলা গদ্যগ্রন্থের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করেন। তিনি নিজে যেমন বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন তেমনি তাঁর অধীনস্থ পন্ডিতদেরও পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করতে উৎসাহিত করেন। এ সুবাদে কেরীর নামে দুটি গ্রন্থ প্রচলিত হতে দেখি। একটি ‘কথোপকথন’ ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয় অন্যটি ‘ইতিহাস মালা’ ১৮১২ সালে মুদ্রিত হয়। কথোপকথনের ইংরেজি নাম Dialogues Intended to facililate the acquiring of the Bangali language. প্রথম বইটি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের কথোপকথন শেখানর জন্য আর দ্বিতীয় বই ইতিহাসমালায় কতকগুলো প্রচলিত গল্প স্থান পেয়েছে। এ গল্পগুলোর নায়ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কেউ কেউ মনে করেন এ গ্রন্থ দুটির আসল রচয়িতা কেরী নন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেরই কোন পন্ডিতের রচনা। পরবর্তী কালে তা কেরীর নামে প্রচলিত হয়ে গেছে। তবে কেরী যে ভাল বাংলা জানতেন তা সম্পর্কে এখন আর কোন সঙশয় নেই। সে দিক থেকে বই দুটি তাঁরই রচনা হওয়া সম্ভব। তবে উইলিয়াম কেরীর অবদান গ্রন্থপ্রণেতা হিসাবে যতটুকু তার চেয়ে অনেক বেশি সেদিন বাংলা চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব দানের। পাঠ্যবই রচনা করতে গিয়েই কেরী বুঝতে পেরেছিলেন বাংলা ভাষার সম্পদ ও তার প্রাণশক্তিকে। তবে উনিশ শতকে বাংলা গদ্য যে ক্রমশ সংস্কৃতানুসারী হয়ে উঠছিল তার নেতৃত্বও দিয়েছিলেন এই উইলিয়াম কেরীই।

কেরীর অধীনে আরও যাঁরা পন্ডিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামরাম বসু উল্লেখযোগ্য। উইলিয়াম কেরী নিজেই এই রামরাম বসুর নিকট একসময় বাংলা শিখেছিলেন। এজন্য রামরাম বসুকে কেরীর মুনশী বলা হয়। রামরাম বসুর দুটি গ্রন্থ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত, ১৮০১ সালে ও “লিপিমালা” ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। রামরাম বসু ভাল ফারসি জানতেন। ‘প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ রচনায় তিনি ফারসি ইতিহাস গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে থাকতে পারেন। ‘প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ বাংলা ভাষায় প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। রামরাম বসুর রচনা সংস্কৃতানুসারী নয়। তিনি প্রয়োজনবোধে প্রচুর আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য পন্ডিতের মধ্যে গোলোকনাথ শর্মার ‘হিতোপদেশ’ (১৮০২), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের। ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং’ (১৮০৫), চন্ডী চরণ মুনশীর ‘তোতা ইতিহাস’ (১৮০৫), হরপ্রসাদ রায়ের ‘পুরুষ পরীক্ষা’ (১৮১৫) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সবিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। কেরীর অধীনে তিনি ছিলেন প্রধান পন্ডিত। মৃত্যুঞ্জয় নাটোরে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় যে বইগুলো রচনা করেন সেগুলো হচ্ছে- ‘বত্রিশ সিংহাসন’ (১৮০২), ‘হিতোপদেশ’ (১৮০৮), ‘রাজাবলি’ (১৮০৮), প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩) এবং ‘বেদান্ত চন্দ্রিকা’ (১৮১৭)। একমাত্র ‘বেদান্তচন্দ্রিকা’ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য রচিত হয়নি।

মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে বাংলা গদ্য অনেকটা সুষম রূপ লাভ করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে তিনিই একমাত্র লেখক যিনি বাংলা গদ্যের রূপ অনেকটাই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ দীর্ঘ দিন বিভিন্ন কলেজে পাঠ্য থাকায় তা লোকপ্রিয় হয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্য চর্চার ক্ষেত্রে যেটি বড় অবদান সেটি হচ্ছে সেদিন তাঁরা বাংলাভাষার অপরীক্ষিত প্রাণশক্তিকে পরীক্ষার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নানা রকম পরীক্ষা - নিরীক্ষা করেছেন। বিবিধ ও বিচিত্র বিষয়কে বাংলা গদ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। যে মাঠে একদিন সোনার ফসল ফলবে সেটি যথার্থ উত্তমরূপে কর্ষণের যে দায়িত্ব সেটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাপ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। এক কথায় উত্তর লিখুন।

ক) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর ঃ ... ...

খ) কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
উত্তর ঃ ... ...

গ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের দায়িত্ব কে পেয়েছিলেন?
উত্তর ঃ ... ...

ঘ) কেরী দুটি গ্রন্থের লোক। একটির নাম ‘কথোপকথন’, অন্যটির নাম কি?
উত্তর ঃ ... ...

ঙ) কেরী সাহেবের মুনশীর নাম কি?
উত্তর ঃ ... ...

চ) বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থের নাম কি?
উত্তর ঃ ... ...

ছ) ‘লিপিমালা’ কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর ঃ ... ...

জ) গোলোকনাথ শর্মার গ্রন্থটির নাম কি?
উত্তর ঃ ... ...

ঝ) ‘তোতা ইতিহাস’ কার রচনা?
উত্তর ঃ ... ...

ঞ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশি খ্যাতিমান মনে করা হয়?
উত্তর ঃ ... ...

ট) ‘প্রবোর্ধচন্দ্রিকার’ লেখক কে?
উত্তর ঃ ... ...

ঠ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ কত সালে খোলা হয়?
উত্তর ঃ ... ...

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১। ক) ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য
খ) ১৮০০ সালে
গ) উইলিয়াম কেরী
ঘ) ইতিহাসমালা
ঙ) রামরাম বসু
চ) প্রতাপাদিত্য চরিত্র
ছ) ১৮০২ সালে
জ) হিতোপদেশ
ঝ) চন্ডীচরণ মুন্সী
ঞ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
ট) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়ঙ্কার
ঠ) ১৮০১ সালে

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ। প্রথম জীবনে প্রাচীন ধরনের সংস্কৃত, আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা করলেও আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা তার মনকে সম্পূর্ণ আধুনিক করে তুলতে পেরেছিল। তিনি একাধারে বেদান্তধর্ম ও একেশ্বরবাদ প্রচার ও অন্যধারে সতীদাহ প্রথাসহ সকল সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। রামমোহন রায়ই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সংস্কার ও পুঁথি শাসিত আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে মানবতন্ত্রবাদকে (Humanism) উচ্চে স্থান দেন।

১৮১৫ সাল থেকে ১৮৩০ সাল, মোট ১৫ বছরের মধ্যে রামমোহন অন্তত ৩০টি বাংলা পুস্তিকা রচনা করেছেন। বাংলা ছাড়া তিনি প্রচুর ইংরেজিও লিখেছেন; তিনি আরবি-ফারসিতেও কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্ত সার' দুটিই ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। রামমোহনের এ গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হলে রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর বিরুদ্ধে লেখেন "বেদান্ত চন্দ্রিকা"। রাম মোহন এর জবাব দেন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার" নামক পুস্তিকায়। ১৮১৮-১৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে "প্রবর্তক ও নিবর্তের সম্বাদ' এবং "গোস্বামীর সহিত বিচার"। কালীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনকে কটাক্ষ করে রচনা করেন "পাষন্ড পীড়ন"। রামমোহন 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩) রচনা করে এর উত্তর দেন। রামমোহন বাংলায় একটি গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। রামমোহন ১৮২২ সালে 'মীরাতুল আখবার' নামে ফারসি ভাষায় একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

রামমোহনের গদ্যে প্রাচীনত্ব ও পন্ডিতিরীতির ছাপ আছে। বাংলা গদ্যের প্রবহমান ছন্দ আবিষ্কারে ব্রতী হয়ে তিনি প্রচুর দাঁড়ি-কমা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এতে তিনি কৃতকার্য হতে পারেননি। রামমোহন সাহিত্য গ্রন্থের লেখক ছিলেন না। তিনি প্রধানত বিতর্কমূলক গ্রন্থের লেখক। তবুও তার ভাষার মধ্যে বিদ্রোহী আত্মার বলিষ্ঠ শক্তির আভাস পাওয়া যায়। বাংলা গদ্য শুধু পাঠ্যপুস্তকের ভাষা নয় - এ সমাজ ও বিতর্কের ও ভাষা।রামমোহন তাঁর রচনায় এ সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

রামমোহনের সমকালীন লেখকবৃন্দ - রামমোহনের সমসাময়িক কালে দু একজন বাদে তেমন উল্লেখযোগ্য লেখক পাওয়া যায় না। কিঞ্চিৎ রচনাশক্তি আছে এমন তিনজন লেখক হচ্ছেন (১) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (২) গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার (৩) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনের সমসাময়িক ও চরমভাবে রামমোহন বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর পাষন্ড পীড়ন" গ্রন্থে রামমোহনকে তীব্র ভাষায় আক্রমন করেন। তাঁর রুচিবিকৃতি থাকলেও গ্রন্থের ভাষায় কিছু সাহিত্য গুণ ধরা পড়ে।

কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির লেখক গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার "স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক" (১৮২২) একসময় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ গ্রন্থে স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন করা হয়েছে। গৌরমোহনের ভাষা সুন্দর ও সহজ।

'সমাচার চন্দ্রিকার' সম্পাদক ভবানীরেণ এ সময়ের আরেকজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক। তাঁর স্বনামে ও ছদ্মনামে এ বইগুলি প্রকাশিত হয়। -কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩), 'দূতি বিলাস' (১৮২৫), নববিবি বিলাস (১৮৩০)। এগুলো সবই নকশা কেন্দ্রিক ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপপূর্ন রচনা। তৎকালীন কলকাতা সমাজে কুৎসিত আচার -আচরণকে লেখক তীব্র ভাষায় আক্রমন করেছেন। এই বিদ্রুপাত্মক নকসাগুলিকে বাংলা উপন্যাসের অগ্রজ বলা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। একটি বাক্যে উত্তর লিখুন।

ক) ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ কাকে বলা যায়?

উত্তর ঃ ... ...

খ) রাজা রামমোহন রায় প্রথম জীবনে কি শিক্ষা করেন।

উত্তর ঃ ... ...

গ) তিনি কি প্রচার করেন।

উত্তর ঃ ... ...

ঘ) সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

উত্তর ঃ ... ...

ঙ) রামমোহন কয়টি বাংলা বই রচনা করেছেন?

উত্তর ঃ ... ...

চ) প্রচুর ইংরেজিসহ্‌ আরবি-বারসিতেও কে বই রচনা করেন?
উত্তর ঃ ... ...
ছ) ‘মীরাতুল আখবার’ কি?
উত্তর ঃ ... ...
জ) ‘প্রবর্তক ও নিবর্তের সম্পাদ’ কার রচনা?
উত্তর ঃ ... ...
ঝ) রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কি?
উত্তর ঃ ... ...
ঞ) রামমোহনের বাংলায় সুসামঞ্জস্য নেই কিন্তু কি পাওয়া যায় বলে বিশেষজ্ঞবৃন্দ মনে করেন?
উত্তর ঃ ... ...
ট) রামমোহন রচিত তিনটি বাংলা পুস্তিকার নাম লিখুন।
উত্তর ঃ ... ...
ঠ) রামমোহনের সমকালীন তিন জন লেখকের নাম লিখুন।
উত্তর ঃ ... ...
ড) পাষন্ড পীড়ন কার রচনা?
উত্তর ঃ ... ...
ঢ) স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক কার রচনা?
উত্তর ঃ ... ...
ন) গৌরমোহনের বই-এর ভাষা কেমন?
উত্তর ঃ ... ...
ত) ‘কলিকাতা কমলালয়’ কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর ঃ ... ...
থ) ‘নব বাবু বিলাস’ ও ‘নব বাবু বিলাস’ কার রচনা?
উত্তর ঃ ... ...
দ) ভবানীচরণের ব্যঙ্গ বিদ্রুপের বিষয় কি ছিল?
উত্তর ঃ ... ...

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক) রাজা রামমোহন রায়
খ) সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি ভাষা
গ) বেদান্ত ধর্ম ও একেশ্বরবাদ
ঘ) রাজা রামমোহন রায়
ঙ) ৩০ টি বাংলা বই
চ) রাজা রামমোহন রায়
ছ) ‘মীরাতুল আযবার’ একটি ফারসি পত্রিকা।
জ) রাজা রামমোহন রায়
ঝ) গৌড়ীয় বাংলা ব্যাকরণ
ঞ) বিদ্রোহী আত্মার বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি
ট) ‘বেদান্ত গ্রন্থ’, ‘বেদান্ত সার’, ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’।
ঠ) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ড) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন
ঢ) গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার
ণ) সুন্দর ও সহজ
ত) ১৮২৩ সালে
থ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ) কলকাতা সমাজের কুৎসিত আচার-আচরণ

তত্ত্ববোধিনী যুগ

বাংলা গদ্যের বিকাশে ব্যক্তি উদ্যোগ যেমন কার্যকর ছিল তেমন সাময়িক নানা পত্র-পত্রিকার প্রকাশ সহায়তা করেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাংলা গদ্যের সর্বজন ব্যবহার্য সাধুরীতির একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে বাংলা গদ্যের কুণ্ঠিত পদক্ষেপ ক্রমশই স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠছিল। ১৮৪৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) এবং প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্রের' (১৯১৪) মত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাও বাঙালির মানস গঠনে ও বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শাস্ত্র, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস - এক কথায় আধুনিক মানুষের প্রয়োজনীয় যা বিষয় সব কিছুরই চর্চা হত এ পত্রিকায়। অক্ষয়কুমার দত্ত বার বৎসর এ পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। বাংলাদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষা ও চিন্তাবিদ সকলেই কোন না কোনভাবে এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা যে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিল তা এখনও স্মরণযোগ্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত
(১৮২০-৮৬)

অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনীর' মত অসামান্য পত্রিকাই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করেননি - তিনি নিজেও ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান লেখক। তাঁর লেখায় একটি জিজ্ঞাসু মন ও শ্রমনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। যে কালে হিন্দু কলেজের ছেলেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়েও মোহগ্রস্ত ও অনুকরণপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন - সেকালে নির্মোহ দৃষ্টিতে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সমাজ গঠনে অক্ষয়কুমার নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। মধ্যযুগীয় সংস্কারতাড়িত সমাজে অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অভিজ্ঞাতামূলক জ্ঞানবাদকে যুক্তির দ্বারা বিচার - বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করেছিলন।

অক্ষয়কুমার অনেকগুলো পাঠ্য বই রচনা করেছিলেন। এখানেও তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মনের পরিচয় আছে। পাঠ্যবইগুলো হচ্ছে - ভূগোল (১৮৪১), চারুপাঠ, তিন খন্ড (১৮৫৩-৫৯) পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬)। তাঁর "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" (প্রথম খন্ড ১৮৫১, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৫৩) কুম্বের The constitution of man (1828) নামকগ্রন্থের ভাব অবলম্বনে রচিত। এ বইয়ে তিনি মানবচরিত্রের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক এবং মানব প্রকৃতি ও সমাজের উন্নতি সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অক্ষয়কুমারের 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) বইটি কুম্বের Moral Philosophy অবলম্বনে রচিত। অক্ষয়কুমারের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম-১৮৭০, দ্বিতীয় ১৮৮৩) উইলসন -এর The religious sects of the Hindoos নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। এ গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড কিছুটা রচিত হয়েছিল। এটি সম্পূর্ন হওয়ার আগেই অক্ষয়কুমার মৃত্যুবরণ করেন। এ গ্রন্থটি অক্ষয়কুমারের জ্ঞান, গবেষণা ও মননশীলতার সার্থখ নিদর্শন।

অক্ষয়কুমারের হাতে বাংলা গদ্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্ব চর্চার সার্থক বাহন হয়ে উঠে। অক্ষয়কুমারের প্রথম দিকের ভাষায় কিছুটা জড়তা থাকলেও তা ক্রমশ কেটে যায় ও ভাষা প্রসাদগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

ক) "তত্ত্ববোধিনী" কিসের নাম?

উত্তর ঃ ... ...

খ) তত্ত্ববোধিনী কে সম্পাদনা করতেন?

উত্তর ঃ ... ...

গ) কখন বাংলা সাধুরীতির কাঠামোটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল?

উত্তর ঃ ... ...

ঘ) 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদক কে ছিলেন?

উত্তর ঃ ... ...

ঙ) 'সবুজপত্র' কি?

উত্তর ঃ ... ...

চ) অক্ষয়কুমারের রচনায় কিসের চর্চা করেন?

উত্তর ঃ ... ...

ছ) অক্ষয়কুমার রচিত তিনটি পাঠ্য বইয়ের নাম লিখুন।

উত্তর ঃ ... ...

জ) কুম্বের The constitution of man এর ভাব অবলম্বনে অক্ষয়কুমার রচিত গ্রন্থটির নাম কি?

উত্তর ঃ ... ...

ঝ) ধর্মনীতি কার রচনা?

উত্তর ঃ ... ...

ঞ) অক্ষয়কুমারের হাতে বাংলা গদ্য কি বিষয় চর্চার উপযোগী হয়ে উঠে?

উত্তর ঃ ... ...

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক) একটি পত্রিকার নাম

খ) অক্ষয়কুমার দত্ত

গ) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে

ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঙ) প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকা

চ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের

ছ) ১. ভূগোল ২. চারুপাঠ ৩. পদার্থবিদ্যা

ঝ) অক্ষয় কুমার দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(১৮২০-১৮৯১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) উনিশ শতকের বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষা। অতি দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করে কেবল প্রতিভা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানবপ্রেমের দ্বারা নিজেকে শুধু প্রতিষ্ঠিতই করেননি - সমাজ ও সাহিত্যের অশেষ উপকার করে গেছেন।

বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল ব্রাক্ষণঘরের সন্তান। উপযুক্ত পিতা-মাতার হাতে লালিত পালিত হয়ে নিজেকে করিতকর্মা মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। ঈশ্বরচন্দ্র অন্যদিকে করুণা ও দয়ার সাগর হিসাবেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। সেকালের বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ কুসংস্কারের বেড়াজালে আটকে পড়ে সমাজের স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলেছিল। বিদ্যাসাগর সমাজের এই রোগকে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি দেখলেন সহমরণ প্রথা, কৌলিন্য বা বহুবিবাহ প্রথা, বিধবা বিবাহের অপ্রচলন হিন্দু সমাজকে পঙ্গু ও স্থবির করে দিয়েছে। সহমরণ প্রথার অযৌক্তিকতা ও নির্মমতা রামমোহন রায় বুঝেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সময়েই এ প্রথার বিলোপ ঘটে। বহুবিবাহ বন্ধকরা, বিধবা বিবাহের প্রচলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরই কীর্তি। বাংলার নারী সাজের প্রতি একাধারে শ্রদ্ধা, স্নেহ ভালবাসার যে আন্তরিকতা বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখি তা তাঁর অগ্রসরমান চিন্তারই প্রতীক। শুধু নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই নয় তিনি চেয়েছিলেন নারীর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাও। বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠায় তাই বিদ্যাসাগরের অবদানকে স্মরণ করতে হয়।

বিদ্যাসাগর সমাজ সেবা ও সংস্কারমূলক কাজের প্রেরণা ছিল মানবতাবাদ। রক্ষণশীল ব্রাক্ষণ পরিবারের সন্তান ও সংস্কৃত কলেজের স্থান হওয়া স্বত্ত্বেও যে বিদ্রোহের বাণী বিদ্যাসাগর সারাটি জীবন বহন করেছেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ইউরোপের দার্শনিক অগাস্ত কোঁতে, স্টুয়াট মিল প্রমুখ ছিলেন বিদ্যাসাগরের আদর্শ। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ এ মহাপুরুষকে অক্ষত রাখেনি। তাঁকে বারবার ব্যঙ্গ–বিদ্রুপ করেছে, প্রবল বিরোধীতা করেছে ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর এসব প্রতিবন্ধকতাকে অমিত তেজ, শক্তি ও সাহস দিয়ে মোকাবিলা করেছেন। বিদ্যাসাগরের সমাজভাবনার পাশাপাশি তাঁর সাহিত্য প্রয়াস সমান উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বিদ্যাসাগর রচিত বাংলা গদ্যসাহিত্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) সমাজ বিষয়ক রচনা। এ বিভাগে "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব- ১৮৫৫) এবং "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" (১৮৭১) ইত্যাদি রচনা।

(২) রম্য জাতীয় রচনা- এ বিভাগে বেনামীতে প্রকাশিত কয়েকটি রচনা এবং স্বনামে রচিত 'আত্মজীবনী' প্রধান। "কস্যাচিত উপযুক্ত ভাইপোস্য" রচিত "অতি অল্প হইল" (১৮৭৩) , "আবার অতি অল্প হইল" (১৮৭৩) প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরেরই রচনা। "যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব মহাকাব্য ব্রজবিলাস" (১৮৮৫) আর "রত্নপরীক্ষা" এ পর্যায়ের দুটি রচনা। বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর অকাল মৃত্যুতে রচিত "প্রভাবতী সম্ভাষণ" (১৮৬৪) এবং তাঁর "আত্মজীবনচরিত" এ পর্যায়ভুক্ত। বিদ্যাসাগরের "আত্মজীবনচরিত" বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী।

(৩) পাঠ্য রচনাসমূহ- স্কুল পাঠ্য হিসাবে রচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে- "বাংলার ইতিহাস" (১৮৪৭-৪৮), বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, নীতিবোধ, কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী প্রবৃতি।

(৪) সাহিত্য- বিদ্যাসাগরের সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে। কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" নাটকের অনুবাদ 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), ভবভূতির উত্তর রামচরিত নাটকের অংশ বিশেষ অবলম্বনে এবং বাল্মিকীর রামায়ণ অবলম্বনে রচিত "সীতার বনবাস" (১৮৬০), শেক্সপীয়ারের কমেডি অব এররস এর অনুবাদ ভ্রান্তি বিলাস (১৮৬৯), এবং মহাভারতের কিছু অংশের অনুবাদ এ পর্যায়ে পড়ে।

বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার শিল্পরূপ গঠনে বিদ্যাসাগরের অবদান অসামান্য। তাঁর আগেও বাংলা গদ্য নানা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল বটে কিন্তু বাংলা গদ্যে তিনিই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। শুষ্ক বক্তব্য সরস ও সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলার দক্ষতা তিনি দেখিয়েছিলেন। বিশৃঙ্খল গদ্যকে শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি স্থাপন করেছিলেন। বাংলা গদ্যের প্রাণশক্তি আবিষ্কারে বিদ্যাসাগরের দুটি প্রধান দান। প্রথমটি হচ্ছে বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দের আবিষ্কার আর দ্বিতীয়টি বাংলা প্রবাদ বা ইডিয়মের সার্থক ব্যবহার। বাংলা গদ্যকে 'শ্বাসপর্ব' এবং 'সার্থ পর্ব' অনুসারে বাংলা বাক্যে প্রচুর অথচ পরিমিত বিরাম চিহ্ন, দাঁড়ি কমার তিনিই প্রথম সার্থক ব্যবহার করেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে রামমোহন এ কাজে সচেষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সিদ্ধি আসেনি। বিদ্যাসাগরের হাতে বিরাম চিহ্নের সার্থক ব্যবহার বাংলা গদ্যকে প্রাঞ্জল ও অধিক অর্থবহ করেছে।

প্রবাদ বা ইডিয়ম প্রত্যেক ভাষারই সম্পদ। বিদ্যাসাগর প্রথম বাংলা গদ্যে দেশী প্রবাদ বা ইডিয়ম সার্থকভাবে ব্যবহার করেন। বেনামীতে লিখিত পুস্তিকাগুলিতে ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠার অনেকটা কারণই প্রবাদগুলোর সচেতন ব্যবহার।

বিদ্যাসাগরের সমাজ বিষয়ক লেখাগুলোর মধ্যে একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। একই সঙ্গে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ও 'আত্মচরিতে' পাওয়া যায় হালকা মনের চটুল ভঙ্গি। কঠিন পৌরুষের আড়াল স্নেহধারায় সিক্ত একটি স্রোত ছিল এ রচনাগুলোতে তা অনুমান করা যায়। সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিদ্যাসাগরই ছিলেন না - ছিলেন করুণা ও দয়ার সাগর। এ দেশের অগণিত নারীর দুর্ভাগ্য মোচনে তাই করুণার সাগর, বিদ্যাসাগর ব্রতী হয়েছিলেন। আজীবন দুঃখিনী সীতা ও শকুন্তলার কাহিনী দুটি অনুবাদে হয়তো এজন্যই তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেউ কেউ শুধু পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও অনুবাদক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একথা অসত্য নয়। তবে মনে রাখা দ্বারা সমাজ সংস্কার ও সহিত্য সাধনা যুগপৎ দায়িত্ব পালনে সেদিনে এটি ছিল মহৎকর্ম। শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী বিদ্যাসাগরকে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। আর অনুবাদগুলিও আক্ষরিক অনুবাদ নয় - ভাবানুবাদ। এছাড়া তাঁর মৌলিক রচনার সংখ্যাও কম নয়। তাঁর 'আত্মচরিত' অসম্পূর্ণ হলেও আজও তা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আত্মচরিত। তাই ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন কারণেই খাটো করে দেখার অবকাশ নাই।

বাংলা গদ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপারিচ্ছন্ন এবং সুসংহত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন - এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন - কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধ জয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিতে হয়।"

রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য যুক্তি সঙ্গত।

বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বল বর্ণনার কিছু দৃষ্টান্ত -

(১) "এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবন গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সঞ্চরমান জলধরমন্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বর্জপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমনীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।" (সীতারবনবাস)

(২) "শকুন্তলা কহিলেন, সখি! যে অবধি আমি সেই রাজর্ষিকে নয়ন গোচর করিয়াছি - এই মাত্র কহিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে কহিতে লাগিলেন, সখি! বল, বল, আমাদের লজ্জা কি? শকুন্তলা কহিলেন, সেই অবধি তাঁহাতে অনুরাগিনী হইয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া, তিনি বিষন্ন বদনে, অশ্রুপূর্ন নয়নে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন"। (শকুন্তলা)

বিদ্যাসাগরের পূর্বে যাঁরা বাংলা লিখেছেন, তাঁরা গদ্যলেখক মাত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম গদ্যাশিল্পী। এজন্য বাংলা গদ্য সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন

ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কালে হিন্দুসমাজে প্রচলিত একটি কুসংস্কার

উত্তর ঃ ... ...

খ) বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের মূল প্রেরণ কি ছিল?

উত্তর ঃ ... ...

গ) অগাস্ত কোঁতে ও স্টুয়ার্ট মিল কি ছিলেন?

উত্তর ঃ ... ...

ঘ) "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" -কি বিষয়ক রচনা।

উত্তর ঃ ... ...

ঙ) বিদ্যাসাগরের অনুদিত কালিদাসের গ্রন্থটির নাম কি?

উত্তর ঃ ... ...

চ) 'ভ্রন্তি বিলাস' কিসের অনুবাদ।

উত্তর ঃ ... ...

ছ) "সীতার বনবাস" কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ ... ...

জ) বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্নের প্রথম সার্থক ব্যবহার কে করেন?

উত্তর ঃ ... ...
ঝ) 'আত্নররিত' কি ধরনের গ্রন্থ?
উত্তর ঃ ... ...
ঞ) বাংলা সাহিত্যে প্রথম গদ্যশিল্পী কে?

উত্তরগুলো মিলিয়ে দিন

ক) বহুবিবাহ প্রথা খ) মানবতাবাদ গ) দার্শনিক
ঘ) সমাজ বিষয়ক রচনা ঙ) অভিজ্ঞান শকুন্তলা চ) কমেডি অব এররস
ছ) ১৮৬০ সালে জ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঝ) আত্মজীবনী
ঞ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

ক) সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র

প্যারীচাঁদ মিত্র
(১৮১৪-৮৩)

উনিশ শতকের আরেক কর্মযোগী পুরুষ প্যারীচাঁদ মিত্র। জন্মেছিলেন কলকাতায় - ধনীর গৃহে। লেখাপড়া করেছেন হিন্দু কলেজে। সম্ভবত ডিয়োজিওর ছাত্র ছিলেন। প্যারীচাঁদ আদর্শবাদী, স্বাধীনচিত্ত ও মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। কর্মজীবনে প্রথমে "ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর" সহ গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন।

সেকালে বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা সাধুভাষা একটি স্নিগ্ধরূপ পেয়েছে। কিন্তু প্যারীচাঁদ এ সাধুরীতির বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের জন্য 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষায় পত্রিকাটি রচতি হত। এ কথ্যভাষাতেই প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। তাঁর ভাষাদর্শের বাহনও ছিল এ পত্রিকাটি।

'আলালের ঘরের দুলালের' দুটি বৈশিষ্ট্য। একটি তার ভাষারীতি, দ্বিতীয়টি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। তবে আলালের ঘরের দুলালের কালবর্তী ও পূর্বে বেশ কিছু আখ্যায়িকা প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৫২ সালে প্রকাশিত, হ্যানা কাথেরিন ম্যালেন্স লিখিত 'ফুলমনি ও করনার বিবরণ' কে অনেকে প্রথম উপন্যাস বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। এ গ্রন্থের লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার। উপন্যাসের যে অখন্ড জীবনদৃষ্টি, অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তা 'ফুলমনি ও করণার' বিবরণে অনুপস্থিত। খ্রিস্টান ধর্মের মাহাত্ম ও নীতি প্রচার ছিল এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। উপন্যাসে সন্ধান করা হয় মানুষের ধর্ম, কিন্তু লেখিকা এখানে সন্ধান করেছেন ধর্মের মানুষকে। তাছাড়া "ফুলমনি ও করুনার বিবরণ" কোন মৌলিক গ্রন্থ নয় - ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ। ইংরেজি প্রচার পুস্তিকা The week এর গল্পাংশে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থেই প্রথম বিস্তৃত দেশজ পটভূমি পাওয়া গেছে। উপন্যাসোচিত একটি জীবন-সমস্যা এখানে আছে সর্বোপরি জীবন সম্বন্ধে লেখকের একটি মানসদৃষ্টি এখানে লক্ষ্য করি। তারপরও বলতে হয় - 'আলালের ঘরের দুলাল' সীমিত অর্থেই উপন্যাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের কলকাতার বাঙালি সমাজের অধ:পতন, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার বর্ণনা ছিল 'আলালের ঘরের দুলালের' মূল উদ্দেশ্য। জমিদারের আদরের সন্তান মতিলাল কুসঙ্গে পড়ে অধ:পাতে যায় ও নানান দুর্ভোগ ও দু:খ সহ্য করে পরে সৎপথে ফিরে আসে। এ তত্ত্বকথাটি প্রচারই "আলালের ঘরের দুলালের" মূল উদ্দেশ্য। তবে নীতিকথার জন্য এর মূল্য নয়। বরং নীতির প্রতীক চরিত্র যেমন বরদাবাবু, রামলাল, বেনুবাবু তেমন উজ্জ্বল ও জীবন্ত নয়। কিন্তু পাশাপাশি বাবুরাম, মতিলাল ও তার কুসঙ্গীরা, ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম - যারা অপদার্থ ও অনৈতিক কাজকর্মের ধারক, তারা আশ্চর্য জীবন্তরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। ঠকচাচার মত ধূর্ত ও স্বার্থপর চারিত্রটি রচনাকৌশলে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারে 'আলালের ঘরের দুলালের' নানান দুর্বলতা আছে। কিন্তু এতে আছে বিশেষ সময় কালের কলকাতার একটি সজীব চিত্র, শিক্ষা, দীক্ষা, আইন-আদালত এবং দৈনন্দিন জবিনের নানা চিত্র এতে প্রতিফলিত হয়েছে। প্যারীচাঁদের সমাজ পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনাশক্তির পরিচয় মেলে। আর এ বর্ণনাশক্তির উপর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব ফেলেছে তাঁর ভাষাদর্শ। বিদ্যাসাগরের গুরুগম্ভীর 'ক্লাসিক' ভাষা ততদিনে শিক্ষিত বাঙালির কাছে শিল্পসৃষ্টির ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু প্যারীচাঁদ সে পথ মাড়াননি। শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সমাজের প্রতি অঙ্গীকার প্যারীচাঁদের এক হয়ে গিয়েছিল। ফলে জনসাধারণের মুখের ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আর তাদের জন্যই "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করা। লেখক বর্ণনা ও চরিত্রকে জীবন্ত করার জন্য কলকাতার চলতি বুলি যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং সংলাপে নাটকীয়তা সৃস্টি করেছে।

প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষার একটি নমুনা - "বাবুরামবাবু চৌগোঁপ্পা - নাকে তিলক - কস্তাপেড়ে ধুতি পরা - ফুলপুকুরে জুতো পায় - উদরটি গজেশের মত - কোঁচান চাদরখানি কাঁধে - এক গাল পান - ইত:স্তত বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন - ওরে হরে। শ্রীঘ্র বালি যাইতে হইবে, দুই চার পয়সায় একখানা চল্‌তি পানসি ভাড়া করতো। বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে ২ বেআদব হয়, হরে বলিল, মোসায়ের যেমন কান্ড। ভাত খেতে বস্তেছিনু - ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তিছি! ... ... চলতি পানসি চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয় - একি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতুগোলা"?

প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্যান্য বই - "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯), রামারঞ্জিকা (১৮৬০), 'কৃষিপাট', "গীতাঙ্কুর" (তৃতীয় সং- ১৮৭০), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫) অভেদী (১৮৭১) "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা" (১৮৭৮), 'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত' আধ্যাত্মিক (১৮৮০), বামাতোষিনী (১৮৮১)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। এক কথায় উত্তর দিন।

ক) প্যারীচাঁদের ছদ্মনাম কি ছিল?

উত্তর ঃ ... ...

খ) কত সালে আলালের ঘরের দুলার প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ ... ...

গ) মাসিক পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

উত্তর ঃ ... ...

ঘ) ভবানীচরণের দুটি আখ্যায়িকার নাম লিখুন।

উত্তর ঃ ... ...

ঙ) "ফুল মনি ও করুনার বিবরণ" কি জাতীয় গ্রন্থ?

উত্তর ঃ ... ...

চ) "মদ খাওয়া দায় জাত থাকার কি উপায়" -এর লেখক কে?

উত্তর ঃ ... ...

ছ) কোন অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে প্যারীচাঁদ তাঁর আদর্শ ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ ... ...

জ) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস কোনটি?

উত্তর ঃ ... ...

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

ক) আলালের ঘরের দুলালকে কেন আমরা প্রথম উপন্যাস বলতে পারি?

খ) প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষাদর্শের পরিচয় দিন।

গ) প্যারীচাঁদ মিত্রের লিখিত গ্রন্থগুলির পরিচয় দিন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ
(১৮৪০-৭০)

কালীপ্রসন্ন সিংহ উনিশ শতকের আরেকজন অবিস্মরনীয় বাঙালি লেখক। তাঁর জীবন পরিধি অল্পকালের। কিন্তু এর মধ্যেই নানান সামাজিক কর্ম ও সাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা এবং নানা সামাজিক আন্দোলনে তিনি জড়িত ছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে তিনি মাইকেল মধুসূদনকে সংবর্ধনা দেন। নাটক 'নীলদর্পনের' ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করার অপরাধে রেভারেন্ড লঙ সাহেবের কারাবাস ও জরিমানা হয়। কালীপ্রসন্ন বিচারের আদালতে রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জরিমানার টাকা প্রদান করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহিত্য প্রতিভা ছিল। ১৮৬২ সালে তাঁর 'হুতোম প্যাচার নকশা' বইটি বের হয়। কয়েকটি নাটক প্রহসন তিনি লিখেছেন- মহাভারতের আংশিক বঙ্গানুবাদও করেছেন। 'হুতোম প্যাচার নকশায়' কলিকাতার হঠাৎ বাবুদের লক্ষ্য করে তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ করা হয়েছে। হিন্দু সমাজের সমাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কালীপ্রসন্ন সিংহ কটাক্ষ করেছেন। ভাষার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। সাধুভাষার বাঁধা রীতিতে পা দেননি বটে, তবে 'প্যারীচাঁদের মত তিনিও আঞ্চলিক ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেখানেও দুজনের তফাত আছে। প্যারীচাঁদ 'গ্রাম্য ও কথ্য ভাষা ব্যবহার করলেও আদলটি ছিল সাধুভাষার। তাছাড়া সাধু ও চলিতে প্রচুর মিশ্রণ আছে প্যারীচাঁদে। কিন্তু কালীপ্রসন্নের ভাষা এ দোষ থেকে মুক্ত। কলিকাতার চলতি বুলি ব্যবহারে কালীপ্রসন্ন অধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাষাজ্ঞান প্রশংসার যোগ্য। কালী প্রসন্ন সিংহের ভাষার একটি নমুনা - 'অমাবস্যার রাত্তির' - অন্ধকার ঘুরঘুট্টি - গুরগুরকরে মেঘ ডাকচে - থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্চে - গাছের পাতাটি নড়ছে না - মাটি থেকে যেন আগুনের ভাপ রেরুচ্চে - পথিকেরা এক একবার আকাশের পানে চাচ্ছেন, আর হন হন করে চলেছেন। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ কচ্চে - দোকানীর ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে যাবার উজ্জুগ কচ্চে - গুড়ুম করে ন'টার তোপ পড়ে গ্যালো"।

আরও কয়েকজন গদ্যলেক

এ যুগে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট গদ্যলেখকের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরা হচ্ছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাশঙ্কর, তর্করত্ন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনানায়ণ বসু। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব চর্চার পথিকৃৎ। তিনি একাধিক সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থের সম্পাদনা করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) ও 'রহস্যসম্পর্ক' (১৮৬৩) জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

তারাশঙ্কর তর্করত্ব (?-১৮৫৮) বিদ্যাসাগরের ছাত্র ও অনুচর ছিলেন। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' (১৮৫৪) এবং জনসনের উপন্যাস অবলম্বনে 'রাসেলাস' (১৮৫৭) রচনা করেন। তাঁর গদ্য গাম্ভীর্যমন্ডিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) তাঁর মহত্ত্ব ও আদর্শনিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত। ব্রাহ্ম সমাজকে নেতৃত্বদান তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্ম। এখানে বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি যে অভিভাষণ দিয়েছেন সেগুলিতে নিষ্ঠা, চিন্তার গভীরতা ও উপলব্ধির নিবিড়তা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ভাষা সহজসরল ও সাহিত্য রসে সিক্ত। মহর্ষ দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মচরিতটি' সেকালের চিত্র ও ভাষার ঐশ্বর্যে দীপ্তিমান।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর শিক্ষা ও স্বদেশপ্রেমে উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব। প্রথম জীবনে ইয়ংবেঙ্গলের দ্বারা প্রভাবিত হলেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজের মহৎ আদর্শগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা হচ্ছে - সেকাল আর একাল (১৮৭৪), বাঙ্গাল ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮), আত্মচরিত (১৯০৯) ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

ক) কালী প্রসন্ন সিংহের ভাষাদর্শ কেমন ছিল?

খ) কালী প্রসন্ন সিংহ কি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

গ) সংক্ষেপে কালী প্রসন্ন সিংহের অবদান লিখুন।

ঘ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন

১. মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর
২. রাজনারায়ণ বসু
৩. বিবিধার্থ সংগ্রহ
৪. রাজেন্দ্রলাল মিত্র

উত্তরঃ পাঠের প্রাসঙ্গিক অংশ থেকে নিজে নিজে উত্তর তৈরি করুন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৩৮-১৮৯৪)

উনিশ শতকের সবচাইতে শক্তিশালী গদ্যলেখক এবং সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিতা দিয়ে শুরু হলেও গদ্যে প্রত্যাবর্তন করতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। তবে বাংলা উপন্যাস লেখার আগে Raj Mohan`s wife (১৮৬৪) নামে ইংরেজিতে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এজন্য যুগান্তকারী যে এইবারই প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি উন্নত, রুচিসম্মত, পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত একটি উপন্যাস হাতে পেলেন। "আলালের ঘরের দুলালে" পরিচিত পরিবেশ ও দেশজ পটভূমি থাকলেও সেখানে ছিল না কল্পনার অবাধ বিহার ও অসাধারণ কোন দীপ্তি। তাই ইংরেজি শিক্ষিত পাঠকের কাছে বাংলা উপন্যাস তৃপ্তিকর ছিল না। কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন মধুসূদন তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্য লিখে পাশ্চাত্য সাহিত্যে মুগ্ধ বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন বাংলা কাব্যের দিকে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও "দুর্গেশনন্দিনী" লিখে পাশ্চাত্য ভাবমুগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি ফেরালেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ আর শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। মোট চৌদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। উপন্যাসগুলোর শ্রেণী ও চরিত্রগত বিভাগ এভাবে করা যেতে পারে-
ক) ইতিহাস ও রোমান্স - দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, সীতারাম।
খ) দেশাত্মবোধক - আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরানী
গ) সমাজ বিষয়ক - বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, কৃষ্ণকান্ডের উইল, রজনী, রাধারানী

তালিকা থেকেই প্রমাণিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা কত বিচিত্রমুখী ছিল। উপন্যাসগুলোর একদিকে যেমন আছে রোমান্সের মনোহর বৈচিত্র্য অন্যদিকে আছে বাস্তব জীবনের মহার্ঘ চিত্র।

ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস - বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্সধর্মী উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল সম্ভার। নিরস ইতিহাসের বিষয়বস্তু মাত্র অবলম্বন করে সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ইতিহাসের কঙ্কালে যখন কল্পনার রূপ রং ও রচনাশৈলীর বিদ্যুৎচ্ছটা প্রতিফলিত হয় তখনই তা হয় সৃজনশীল সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে প্রথম ইতিহাসে কল্পনার রং চড়িয়ে সৃষ্টি করেছেন ঐতিহাসিক রোমান্স। মোগল ও পাঠান দ্বন্দ্বের স্বল্পপরিচিত ঘটনার উপর প্রচুর কল্পনা ও রোমান্টিকতার রং চড়িয়ে রচিত হয়েছে দুর্গেশনন্দিনী। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের প্রতি পাঠান কন্যা আয়েষা এবং গড়মান্দারণ দুর্গের অধিপতি বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমার আকর্ষণের কাহিনীই উপন্যাসের মূলকাহিনী। চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনার বিন্যাস, কল্পনার ঐশ্বর্য, বর্ণনার অননুকরনীয় ভঙ্গি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব দ্রুত সিদ্ধির কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছে।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা'। নির্জন সমুদ্রের তীরে জনমানবহীন অরণ্যে আজন্ম লালিত পালিত কপালকুন্ডলার সঙ্গে সপ্তগ্রাম নিবাসী নবকুমারের বিয়ে এ উপন্যাসের বর্ণিতব্য বিষয়। আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে লেখক এখানে কাহিনী বয়ন করেছেন। দাম্পত্যজীবনের সঙ্কট ও মনস্তাত্ত্বিক বৈপরীত্য ও সংঘাতকে লেখক চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষ পর্যন্ত কপালকুন্ডলা অরণ্য ও সমুদ্রের আহ্বানকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। কপালকুন্ডলার আত্মবিসর্জনের মধ্যে শেষ হয়েছে উপন্যাসটি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাস মৃণালিনী (১৮৬৯)। মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পটভূমিকায় মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের প্রণয়কাহিনী এর মূল বিষয়। যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) উপন্যাস - বড় গল্প মাত্র। চন্দ্র শেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ ১৮৮২) ও সীতারাম (১৮৮৭) ঐতিহাসিক রোমান্স।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে রাজসিংহকেই (১৮৮২) একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মনে করতেন। এতে মোগল ও রাজপুতদের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে।

দেশাত্মবোধক উপন্যাস - বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (১৮৮২) ও দেবী চৌধুরানী আদর্শভিত্তিক দেশাত্মবোধক উপন্যাস। আনন্দ মঠের বিষয়বস্তু উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এখানে বঙ্কিমের নিজস্বদৃষ্টিভঙ্গিতে স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হচ্ছে। 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে গীতার নিষ্কামতত্ত্ব ও নারীর পারিবারিক কর্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এ দুটি উপন্যাসেই কাহিনী অংশ দুর্বল ও নানান অসঙ্গতিতে পূর্ণ।

সমাজজীবন বিষয়ক উপন্যাস - সমাজ, গার্হস্থ্য ও পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে আমরা আরেক বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাই। রোমান্টিক উপন্যাসের মত এক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ইন্দিরা (১৮৭৩) ও রাধারানী (১৮৮৬) দুটি বড় গল্পমাত্র। বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) ও রজনী (১৮৭৭) উপন্যাসে উচ্চবিত্তের কাহিনী স্থান পেয়েছে। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর প্রেমে পরিতৃপ্ত হয়েও বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রেমাসক্ত হয়। কৃষ্ণকান্তের উইলেও মোহের বশে গোবিন্দলাল ভ্রমরের

পরিবর্তে রোহিনীর প্রেমাসক্ত হল। কাহিনী বর্ণনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় রেখেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ তাঁর সৃষ্ট নারী কুন্দনন্দিনী, রোহিনীরা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ও নীতিপরায়নতার যুপকাষ্ঠে আত্মবলিদান করতে বাধ্য হয়েছে। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু ও রোহিনীর হত্যা এ উপন্যাস দুটির দুর্বলতম দিক।

রজনী (১৮৭৭) তত জনপ্রিয় না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। The last days of pompei উপন্যাসের ছায়া এতে আছে বলে অনেকে মনে করেন।

উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিম আরও নানারকম গ্রন্থ রচনা করেছেন। ‘বঙ্গদর্শন’ নামে একটি উন্নত মানের পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা একটি উল্লেখযোগ্য কর্ম। এ পত্রিকাতেই তাঁর লোকরহস্য, কমলাকান্ত ও মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানরহস্য প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। সাম্য প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। এছাড়া হিন্দু ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব ১৮৮৬ ও ১৮৮৮ সনে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন। এর মধ্যে আছে “রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকা” ও সঞ্জীবচন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী।

লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও সুষমামন্ডিত করা। একদিকে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারী সাধুরীতি, অন্যদিকে প্যারীচাঁদ ও কালী প্রসন্ন সিংহের কলকাতার আঞ্চলিক কথ্য ভাষার কোনটিকে গ্রহণ না করে বঙ্কিমচন্দ্র সুসমন্বিত ছন্দময় বাংলা গদ্য ব্যবহার করলেন। সংস্কৃতানুসারী পন্ডিতেরা প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু-লঘু ভার সমন্বিত গদ্যকে উপহাস করেছেন। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুন্ডলার ভাষা তাদের উপহাসকে শুধু ম্লান করে দেয়নি - এ ভাষা তার বিজয় পতাকা সমুন্নত রেখেছে বহুকাল।

বঙ্কমচন্দ্রের গদ্যরীতির নমুনা-

“৯৯৭ বঙ্গাজের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে গড় মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমনি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকান্ড প্রান্তর, কি জানি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল। ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদ মালায় আবৃত হইতে লাগিল।” (দুর্গেশনন্দিনী)।

ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি! সেই গম্ভীর নাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমনী মূর্তি। কেশভার - অবেনী সম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত - আগুলফ লম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র শোভা পাইতেছে (কপালকুন্ডলা)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। এক কথায় উত্তর দিন।
- ক) ‘দুর্গেশনন্দিনী’ কত সালে প্রকাশিত হয়?
- খ) ‘কপালকুন্ডলার’ রচয়িতা কে?
- গ) ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ কি ধরনের উপন্যাস?
- ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র নিজের তাঁর কোন উপন্যাসকে ঐতিহাসিক বলে মনে করতেন?
- ঙ) ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইলের’ কোন বিষয়টি দুর্বলতার প্রতীক।
- চ) মৃণালিনী উপন্যাসে পটভূমি কি?

২। সংক্ষপ্তি উত্তর লিখুন।
- ক) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?‘
- খ) উপন্যাস ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের পরিচয় দিন।
- গ) বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের একটি বর্ণনা দিন।
- ঘ) বঙ্গদর্শন কি?
- ঙ) বাংলা গদ্যের বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান শিরোনামে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখুন।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

১। ক) ১৮৬৫ সালে
- খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ) সামাজিক উপন্যাস ঘ) রাজসিংহ
ঙ) কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু ও রোহিনীর হত্যা।
চ) মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের পটভূমিকা

২। পাঠ দেখে নিজে নিজে উত্তর তৈরি করুন।

রমেশচন্দ্র দত্ত

(১৮৪৮-১৯০৯)

রমেশচন্দ্র দত্ত একজন সিভিলিয়ান হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তিনি প্রচুর লিখেছেন। কাব্য, অর্থনীতি, দর্শনসহ অনেকক্ষেত্রেই তাঁর সহজ বিচরণ ছিল। রমেশচন্দ্র মোট ছয়টি উপন্যাস রচনা করেন। এর চারটি ঐতিহাসিক ও দুটি সামাজিক। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কন (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮), রাজপুত্র জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯) ইতিহাস অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস দুটির নাম - সংসার (১৮৮৬) এবং সমাজ (১৮৯৪)। উভয় উপন্যাসেই পারিবারিক জীবনের চিত্র আছে।

দামোদর মুখোপাধ্যায়

(১৮৫৩-১৯০৭)

একসময় বাংলা সাহিত্যে 'উপসংহার' লেখার বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'কপালকুন্ডলার' মৃন্ময়ী নামে উপসংহার সূচক উপন্যাস লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে তিনি 'নবাব নন্দিনী' উপন্যাস লেখেন। তাঁর দুটি অনুবাদগ্রন্থ বাঙালি পাঠকের কাছে খুব সমাদৃত হয়েছিল। একটি ওয়াল্টর স্ক রচিত "ব্রাইড অব লাসের মূর" অবলম্বনে রচিত "কমলকুমারী" (১৮৮৪) অন্যটি উইলকি কলিন্সের "উম্যান ইন হোয়াইট" অবলম্বনে রচিত "শুক্লবসনা সুন্দরী" (৩ খন্ড, ১৮৮৫, ১৮৮৮, ১৮৯০)। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেগুলো হচ্ছে- মৃন্ময়ী (১৮৭৪) শান্তি (১৮৭৩), যোগেশ্বরী (১৮৯৮), অন্নপূর্ণা (১৯০২) ও অমরাবতী (১৯০৫)।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৩৮-৮৯)

সঞ্জীবচন্দ্র ছিরেন বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই। সঞ্জীবচন্দ্রের হাতেই আধুনিক ভ্রমণকাহিনীর সূত্রপাত। তাঁর 'পালামৌ' একটি চমৎকার ভ্রমণকাহিনী। ছোটনাগপুরের অরণ্য ও তার অধিবাসীদের মাধুর্যমন্ডিত করে এ গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র রামেশ্বরের অদৃষ্ট এবং 'দামিনী' গল্প, কণ্ঠমালা (১৮৭৭) এবং মাধবীলতা (১৮৮৪) নাম দুটি উপন্যাস ও 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩) নামে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী লিখেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৪৭-১৯১৯)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা গদ্যসাহিত্যে একটি নতুন ধারার সংযোজন করেছিলেন। অসাধারণ কল্পনাশক্তি দিয়ে অসম্ভবের চিত্রপট তিনি তৈরি করেছিলেন। 'কঙ্কাবতী' (বাং- ১২৯৯) তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে "যোকলা দিগম্বর" (বাং- ১৩০৭), মুক্তমালা (১৯০১) ও ডম্বরু চরিত। ত্রৈলোক্যনাথের রচনারীতি একান্ত নিজস্ব।

মীর মশাররফ হোসেন

(১৮৪৭-১৯১২)

মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭ সনে নদীয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থেকে প্রকাশিত গ্রামবার্তার সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙ্গাল হরিনাথ মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যগুরু ছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'ও লিখে একসময় হাত পাকিয়েছিলেন তিনি।

মীর মশাররফ হোসেনের পূর্বে বাংলা গদ্যসেবী তেমন মুসলিম গদ্যলেখক পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারায় হিন্দু লেখকগণ তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। মীর মশাররফ হোসেন এ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন বিচিত্রতার সাধক। একই সঙ্গে তিনি কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, আত্মজীবনী লিখেছেন। তাঁর রচনা সংখ্যা বিপুল।

মীর মশারেরফ হোসেন লেখক হিসাবে সমাজ বিচ্ছিন্ন অবশ্যই ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মধ্যে একধরনের নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাই 'জমিদার দর্পন', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' প্রভৃতি রচনায়। মুসলমানদের সংগঠন Mohamedan Literary Society এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আব্দুল লতিফের নামে তাঁর বসন্তকুমারী নাটক উৎসর্গ করেন। লেখনীতে সমাজ সচেতনতার পরিচয় থাকলেও তাঁর সমসাময়িককালে বঙ্গভঙ্গ অথবা কিছু পূর্ববর্তী ওহাবী আন্দোলনের কোন প্রভাব তাঁর সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তদানীন্তন অনেক মুসলিম সাহিত্যিকের মত ইসলাম প্রচারকের ভূমিকায়ও তিনি অবতীর্ন হননি। কিন্তু ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর মুগ্ধতার পরিচয় আছে বিভিন্ন গ্রন্থে।

মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থের তালিকা-

উপন্যাস

১. বত্মবতী (১৮৬৯)
২. বিষাদসিন্ধু (১৮৮৫-১৮৯১)
৩. উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০)
৪. গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯)
৫. ইসলামের জয় (প্রবন্ধোপন্যাস)

নাটক

১. বসন্তকুমারী নাটক (১৮৭৩)
২. জমিদার দর্পন (১৮৭৩)
৩. বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯)
৪. টালা অভিনয় (১৮৯৯)

প্রহসন

১. এর উপায় কি? (১৮৭৬)
২. ভাই ভাই এইতো চাই (১৮৯৯)?
৩. ফাঁস কাগজ (১৮৮৯)?
৪. এ কি? (১৮৯৯)?

কাব্য

১. গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরীসেতু (১৮৭৩)
২. সংগীত লহরী (১৮৮৭)
৩. পঞ্চনারী পদ্য (১৮৯৯)
৪. প্রেম পারিজাত
৫. বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫)
৬. হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫)
৭. হযরত হামজার ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫)
৮. হযরত বেলালের জীবনী (১৯০৫)
৯. মদিনার গৌরব (১৯০৬)
১০. মোস্লেম বীরত্ব (১৯০৭)
১১. বাজীমাৎ (১৯০৮)

১২. মৌলুদ শরীফ

প্রবন্ধ

১. গো জীবন (১৮৮৯)
২. আমার জীবনী (১৯০৮-১০)
৩. হযরত ইউসোফ (১৯০৮)
৪. বিবি কুলসুম বা আমার জীবনী (১৯১০)

এছাড়া আজিজন নেহার নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মীর মশাররফ হোসেনের সবচেয়ে বড় কীর্তি 'বিষাদ সিন্ধু' রচনা। ইসলামের ইতিহাসের মর্মন্তুদ কাহিনী, কারবালা প্রান্তরে ঘটে যাওয়া ট্রাজিক কাহিনী এর বিষয়বস্তু। ইতিহাসের খাঁটি দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত নয়। ইতিহাসের সঙ্গে নানা কল্পকাহিনী এতে মিশ্রিত হয়েছে। কারবালার মর্মান্তিক কাহিনীকে নিয়ে বাঙালি মুসলিম মানসের যে আবেগ তাকে মীর মশাররফ বুঝতে পেরেছিলেন। সত্য-মিথ্যার আবরণে ঢাকা সে আবেগকে বিষাদসিন্ধুতে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পেরেছেন। তবে বিষাদসিন্ধু খাঁটি ইতিহাস যেমন নয় - তেমনি দৃঢ়বদ্ধ আঙ্গিকের উপন্যাসও নয়। এ ইতিহাস, উপন্যাস, কল্পকাহিনী, নাটকের এক মিশ্রিত রূপ। এখানে রোমান্টিকতা আছে, মানবিক দুর্বলতার পরিচয় আছে। উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ যে নেই - তাও নয়। তবে সব মিলিয়ে এটি একটি শংকর বা মিশ্রসৃষ্টি। বিষাদসিন্ধু বহুল পঠিত ও জনপ্রিয় একটি রচনা।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' মীর মশাররফ হোসেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। (গাজী মিয়ার বস্তানী) অনেকটা রসরচনার মত- উপন্যাসের মত নয়। এর গোত্র অনেকটা "হুতোম প্যাচার নকশা" অথবা "কমলাকান্তের দপ্তরের" মত। তবে কমলাকান্তের অন্তর্দৃষ্ট গাজী মিয়াতে নেই। একটি শিথিল বিন্যস্ত প্লটে কাহিনীট জমে উঠেনি। অসংখ্য নরনারী এখানে ভীড় করেছে। কিন্তু তাদের মৌল কোন ঐক্য নেই। তাই গাজী মিয়াকে বড়জোর শিথিল ও রম্যজাতীয় উপন্যাস বলা যেতে পারে।

'গাজী মিয়ার বস্তানী', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'আমার জীবনী' 'বিবি কুলসুম' আত্মজীবনীমূলক রচনা। তবে বস্তানী আত্মজীবনীর প্রচুর কথা থাকলেও তা মূলত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক রচনা।

মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদ সিন্ধু' লিখেছেন আবেগময় সাধু গদ্য রীতিতে। তাঁর বাচনভঙ্গী ও ভাষার কুশলতা বিষাদ সিন্ধুর জনপ্রিয়তার একটি কারণ। সাধু গদ্যে যেমন মীর মশাররফ হোসেন সাফল্য তেমনি আছে চলিত রীতিতে রচনায়ও। গাজী মিয়ার বস্তানী চলিত রীতিতে রচিত। মীর উভয় ভাষাতেই যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

মোজাম্মেল হক
(১৮৬০-১৯৩৩)

বাংলা গদ্যের অন্যতম মুসলিম লেখক মোজাম্মেল হক। তিনি ১৮৬০ সালে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মোজাম্মেল হক একাধারে কবি ও অন্যধারে একজন কৃতি বাংলা গদ্যলেখক। তিনি গদ্যে জীবনচরিত এবং উপন্যাস রচনা করেছেন। পারস্য সাহিত্য থেকে কিছু অনুবাদও করেছিলেন। মোজাম্মেল হকের গদ্য রচনাবলী নিম্নরূপ–

জীবন চরিত

১. মহর্ষি মনসুর (১৮৯৬)
২. ফেরদৌসী (১৮৯৮)
৩. তাপস কাহিনী (১৯১৪)
৪. খাজা ময়েজউদ্দীন চিশতি (১৯১৮)
৫. হাতেম তাই (১৯১৯)
৬. টীপুসুলতান (১৯৩১)
৭. বড়পীর চরিত

অনুবাদ

শাহনামা ১ম খন্ড (১৯০৯)

উপন্যাস

১. দরাফখাঁ গাজী (১৯১৯)
২. জোহরা (১৯১৭)
৩. রঙ্গিলাবই (অপ্রকাশিত)

মোজাম্মেল হক প্রথমে 'লহরী' ও পরে 'মোসলেম ভারত' নামে সাহিত্য পত্রিকা বের করেন। এই 'মোসলেম ভারতে' কাজী নজরুল ইসলামের বেশ উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রকাশিত হয়। মোজাম্মেল হকের জীবন চরিতগুলি মুসলমানদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস আছে। পারস্য সাহিত্যের বিখ্যাত মহাকাব্য 'শাহনামা'কে তিনি বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। শাহনামার রচয়িতা ফেরদৌসীকে নিয়ে ফেরদৌসী চরিত রচিত। 'টীপু সুলতান' -এ স্বাধীনতাকামী টিপুর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

জোহরা মুসলিম সমাজের জীবনচিত্র নিয়ে লিখিত উপন্যাস। এখানে মোজাম্মেল হকের সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ব্যবহারে মোজাম্মেল হক নিপুন শিল্পী। তাঁর গদ্য বেগবান, জড়তাহীন ও জমাটবদ্ধ।

অন্যান্য লেখকবৃন্দ

মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) ও পন্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮) একই সময়বর্তী ও একই অনুসারী লেখক। নিছক সাহিত্য সাধনা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। সমাজ সেবা ও সংস্কারের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সাহিত্য সেবা জড়িত হয়ে গিয়েছিল। মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন কিছুদিন 'মুসলমান', 'নবসুধাকর' ও 'ছোলতান' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'তোহফাতুল মুসলেমীন', গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৯৯, ১৯০৯), হযরত মোস্তফার জীবনচরিত (১৯২৭) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পন্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশহাদীর বইগুলো হচ্ছে-
১. সুরিয়া বিজয় (১৮৮৯)
২. সমাজ ও সংস্কারক (১৮৮৯)
৩. অগ্নিকুক্কুট (১৮৮৯)
৪. প্রবন্ধকৌমুদী (১৮৯১)

'সুরিয়া বিজয়' এ আছে হযরত আবু বকর কর্তৃক সিরিয়া বিজয়ের কাহিনী। 'সমাজ ও সংস্কারকে' আছে বিপ্লবী জামালুদ্দীন আফগানীর জীবন ও চিন্তাধারার পরিচয়।

বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি
রবীন্দ্রনাথ
(১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যে এমন প্রায় কোন দিকই নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে মোহনীয় যাদু সৃষ্টি হয়নি। কাব্য, নাটক, গদ্য সর্বত্র তিনি অসামান্য প্রত্যয়ে ও দৃপ্ত পদক্ষেপে বিচরণ করেছেন। নিচে তাঁর গদ্য রচনা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

উপন্যাস

একেবারে তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ করুণা (১৮৭৭-৭৮) নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। এটি ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক উপাদান অবলম্বন করে তিনি রচনা করেন বউঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩) ও রাজর্ষি (১৮৮৭)। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্কিমের অনুসারী। কাহিনী নির্মাণে ও ভাষাদর্শে রবীন্দ্রনাথ তখনও নিজস্বতা খুঁজে পাননি। এ দুটি উপন্যাস রচনার পর দীর্ঘ দিন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পাওয়া যায়নি। ১৯০৩ সালে গ্রন্থাকারে 'চোখের বালি' প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই শুধু প্রকাশ পেল না, বাংলা উপন্যাসেরও মুক্তি ঘটল। চোখের বালিতে কাহিনী বর্ণনার নিপুনতার সঙ্গে চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতা, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও মনোবিশ্লেষণের প্রয়োগ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এল। বালবিধবা বিনোদিনীর চিত্তের দাহ ও মানসিক চিত্র যথাযথভাবে এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। 'চোখের বালি'র পরে ১৯০৬ সালে নৌকাডুবি প্রকাশিত হয়। নৌকাডুবি নানা দিক থেকে দুর্বল উপন্যাস। শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে শুধু নৌকাডুবি উপন্যাসেই লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস ‘গোরা’ এর বিশালতা ও ব্যাপ্তি মহাকাব্যিক। সামাজিক এবং ধর্মমতবাদগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভকে লেখক নিপুনভাবে বিশ্লেষণ করেছন। সঙ্কীর্ণতাকে পরিহার করে উদার মানবিকতায় পৌছানর কৃতিত্ব লেখক রবীন্দ্রনাথের।

স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসটি। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসটি সামাজিক। ‘শেষের কবিতা’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্চর্য সুন্দর একটি সৃষ্টি। এর কাব্যময়তা উপন্যাসের গন্ডীকে ছাড়িয়ে গেছে কিনা তা একটি প্রশ্ন। জাগতিক প্রাত্যহিকতার বাইরে নিটোল একটি প্রেমের কাহিনী শেষের কবিতা। এর কবিতাগুলি উপন্যাসের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

‘দুই বোন’ উপন্যাসের কাহিনী পারিবারিক। ‘মালঞ্চ’ ও একই ধরনের উপন্যাস। ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসের প্রধান প্রসঙ্গ রাজনীতি।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ একজন মহান শিল্পী।

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ

অন্যান্য শাখার মত ছোটগল্পও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে জন্মলাভ করেছে। তবে সেখানেও ছোটগল্পের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। গল্প চিরকালই ছিল - এখনও আছে। মানুষ গল্প শুনতে যেমন ভালবাসে তেমন গল্প বলতেও। তবে সে গল্প আর আধুনিক কালের ছোটগল্প এক নয়। উপন্যাসে মানব জীবনকে দেখা হয় অখন্ড দৃষ্টিতে। এর উল্টোদিকে ছোটগল্পে মানুষের জীবনকে দেখা হয় খন্ড দৃষ্টিতে। অর্থাৎ মানুষের জবিনের একটা কি দুটো দিকই ছোটগল্পে বিবেচ্য। ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলা হয়েছে “A short story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method”. এ সংজ্ঞায় স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে - ছোটগল্প সবধরনের বাহুল্যবর্জিত, ঘটনা বা চরিত্র বা তাদের একাংশই ছোটগল্পে স্থান পায়। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের ব্যবধান দুস্তর। তবে গীতিকবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। গীতিকবিতা কবির নিজ স্বভাবে রঞ্জিত তেমনি ছোটগল্পে লেখকের দেখা জীবন ও ধারণায় (impression) রূপায়িত।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও গল্প ও আখ্যায়িকা জাতীয় কিছু রচনার সৃষ্টি হলেও সেগুলো আধুনিক ছোটগল্প নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে যখন জামিদারী পরিদর্শনে শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর ভ্রমণে ব্যস্ত তখন ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে একটি করে ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। এ গল্পগুলিতে পল্লী-গ্রামের অদেখা, অচেনা মানুষ, গ্রামীণ ছবি ও প্রকৃতি সুখদুঃখের সংসার, পারিবারিক নানান কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছিল। পোস্টমাস্টার, ছুটি, কাবুলিওয়ালা, প্রভৃতি গল্পে দৈনন্দিন জীবনের ছবি পাই। একরাত্রি, মহামায়া, মধ্যবর্তিনী, দুরাশা, ‘নিশীথে’ প্রভৃতি গল্পে প্রেমের ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। ‘নষ্টনীড়’ একটি চমৎকার ছোটগল্প। অমল ও চারুর সম্পর্ককে লেখক খুবই নিপুনতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন।

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে গূঢ় একটি সম্পর্ক আছে এবং মানুষ ও প্রকৃতি একে, অন্যের পরিপূরক হয়ে আছে ‘মেঘ ও রোদ্র’, ‘অতিথি’, ‘আপদ’ প্রভৃতি গল্পে তার পরিচয় পাই। অতিপ্রাকৃত বেশ কিছু ছোটগল্পও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘কঙ্কাল’, ‘নিশীথে’, ‘মণিহার’ এর উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলির একটি বিশিষ্টতা আছে। মানুষের জীবনের আঙ্গিকেই অতিপ্রাকৃত রস তাঁর গল্পগুলিতে জমে উঠেছে। তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি ভৌতিক ও উদ্ভট গল্পে পরিণত হয়নি।

‘হিতবাদী’র যুগে শুরু করে শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নানান ধরনের গল্প লিখেছেন। ‘রবিবার’, ‘শেষকথা’, ‘ল্যাবরেটরি’ প্রভৃতি শেষ জীবনের গল্পে আধুনিক জীবনের নানা সমস্যার কথা আছে।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যতম ছোটগল্প লেখক। জীবনের বাঁকে বাঁকে নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পেরও পরিবর্তন হয়েছে। এ পরিবর্তন হয়েছে নানাভাবে- কখনো আঙ্গিকে, কখনো বিষয়ে, কখনো ভাবে ও ভাষায়।

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের হাতে বাংলা গদ্য ধর্ম ও বিতর্কের ভাষা থেকে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আমরা চিন্তা ও মননশীল প্রবন্ধ রচিত হতে দেখি। তাঁর সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা মননশীল প্রবন্ধ রচনার একটি লেকক ও পাঠকগোষ্ঠী তৈরিতে সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথ খুব কম বয়সেই গদ্যরচনার দিকে মনোযোগী হন। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ সব রচনাতে যে তাঁর বিচক্ষণতা ধরা পড়েছিল তা নয়। যেমন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সমালোচনার কথা বলা যেতে পারে। এ সমালোচনায় লেখকের নবীন বয়স্কতার ছাপ আছে। তবে একথা স্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চা জীবনের প্রথম দিকেই শুরু হয়েছিল এবং তা জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল। প্রায় পঁয়ষট্টি বছর রবীন্দ্রনাথ নানান ধরনের গদ্য লিখেছেন। এগুলোর বিষয় মহৎ কবির কাব্য চর্চার পাশাপাশি এমন বিপুল বৈচিত্র্যের গদ্য রচনা চমকপ্রদ বিষয় এবং বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে প্রায় তুলনারহিত। তাঁর গদ্য রচনাবলীকে যথার্থভাবে বিভক্ত করাও কঠিন। তবে পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নোক্তভাবে গদ্য রচনাবলীকে ভাগ করতে পারি।

ক)সাহিত্য সমালোচনা
খ) রাজনীতি ও সমাজনীতি ও শিক্ষা
গ) ধর্ম, দর্শন
ঘ) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ
ঙ) চিঠিপত্র
চ) ভ্রমণ কাহিনী, ডায়েরী

সাহিত্য সমালোচনা

সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে বহু আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৮), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৩৫০)। এ গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও আধুনিক, ভারতীয় ও বিদেশী সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য সমালোচনার ধারাটি তৈরি করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী না হয়ে সাহিত্য সমালোচনায় ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য সাহিত্যের মূলরহস্য সন্ধানে চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায়, সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত আনন্দের বিষয়টি প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য সমালোচনা করেছেন। 'সাহিত্য' এবং 'সাহিত্যের পথে' দুটো গ্রন্থেই দার্শনিক গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। মাঝে মাঝে ঔপনিষদিক তত্ত্বকথা সাহিত্য সমালোচনায় ছায়া ফেলেছে। 'আধুনিক সাহিত্যে' আধুনিক যুগের বাংলা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশ্লেষণ আছে। 'লোক সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ লোকপ্রচলিত ছড়া ও কবিগান সম্বন্ধে মৌলিক আলোচনা করেছেন। 'বাংলাভাষা পরিচয়' (১৯৩৮), 'ছন্দ' (১৯৩৬), 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯) - এ তিনটি বইয়ে ব্যাকরণ ও ছন্দের মত নিরস বিষয়েও তাঁর অভিনিবেশের প্রমাণ রেখেছেন। সাহিত্য সমালোচনায় বিচার বিশ্লেষণের সঙ্গে লেখকের রসভোগ ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

রাজনীতি ও সমাজনীতি ও শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিক আবহাওয়ার মধ্যে শৈশব কাটিয়েছেন। হিন্দু মেলায় শৈশবকালে তিনি একটি কবিতাও পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঠিক প্রখর দৃষ্টি ছিল বলে সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন সমস্যা ও আন্দোলন তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখী উৎসব, শিবাজী উৎসব, স্বদেশী শিল্প প্রসার সংবেদনশীল মানুষ। তাই সামাজিক ও রাজনীতি ও শিক্ষা বিষয়ে তিনি অকপটে তাঁর অনুভূতি ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তিনি অতি উগ্রতাকে কখনও অনুমোদন করেন নি। রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা সমস্যামূলক বইগুলো হচ্ছে- আত্মশক্তি (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'শিক্ষা' (১৯০৮), রাজাপ্রজা (১৯০৮) স্বদেশ (১৯০৮), পরিচয় (১৯১৬), কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সঙ্কট (১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথ সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি সর্বত্রই মনুষ্যত্বের বিকাশকেই কামনা করেছিলেন।

ধর্ম ও দর্শন

রবীন্দ্রনাথ উদার মানবতাবাদী মানুষ ছিলেন। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণে নিজেকে তিনি বেঁধে রাখেন নি। উপনিষদ যেমন তাঁকে প্রভাবিত করেছে তেমনি বৈষ্ণব-বাউলবাদ ও তাকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বমানব ধর্মে বিশ্বাসী। তাঁর ধর্ম ও আধ্যাত্মিক, দর্শনিক প্রবন্ধ ও অভিভাষণে এবক্তব্যই ফুটে উঠেছে। ধর্ম ও দার্শনিকতা সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১৯১৬), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩)।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ

ব্যক্তিমনের অনুরাগে রঞ্জিত হয়েই সাহিত্য সৃস্টি হয়। বিশেষভাবে ব্যক্তিমনের প্রকাশ ঘটে থাকে ব্যক্তিগত রচনা বা প্রবন্ধে। 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭), 'লিপিকা' (১৯২২), ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হিসেবে চিহ্নিত। পঞ্চভূতকে মানুষ কল্পনা করে বিতর্ক জমিয়ে তুলেছেন 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' ব্যক্তিমনের আবেগ ও দার্শনিক চিন্তাই প্রধান। জীবনস্মৃতি, ডায়েরী, চিঠিপত্র সর্বত্রই তাঁর ব্যক্তিমনের অনুভূতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী' (১৮৯১-৯৩), 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), জাপানযাত্রী (১৯১৯), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), ছেলেবেলা (১৯৪০), ছিন্নপত্র (১৯১২) এ পর্যায়ের গ্রন্থ।

প্রমথ চৌধুরী
(১৮৬৮-১৯৪৪)

বাংলা গদ্য চর্চায় বিশিষ্টতার জন্য প্রমথ চৌধুরী খ্যাতিমান। রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করেও বাংলা গদ্যে একটি স্বতন্ত্র যুগের সূত্রপাত তিনি করতে পেরেছিলেন। বাংলায় কথ্যরীতির সাহিত্যিক স্বীকৃতি তাঁরই হাতে সম্পন্ন হয়েছে। ভবানীচরণের হাতে কথ্যরীতির সুচনা, প্যারীচাঁদ ও কালী প্রসন্ন সিংহের হাতে এ রীতির বিকাশ ও প্রমথ চৌধুরীর হাতে কথ্য ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ বাংলা সাহিত্যের অনন্য ঘটনা। ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্রের' প্রকাশ। এই সবুজপত্রকে ঘিরেই প্রমথ চৌধুরী চলতি ভাষার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথও সবুজপত্রকে স্বাগত জানিয়ে নিজেও চলিত ভাষায় রচনা শুরু করেন। প্রমথ চৌধুরীর তেল-নুন-লাকড়ি (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৭), নানাকথা (১৯১৯), 'রায়তের কথা' বিখ্যাত গ্রন্থ। প্রমথ চৌধুরীর 'চলিত ভাষা' শুধু ক্রিয়াপদের হ্রস্বতায় পর্যবসিত হয়নি। তাঁর ভাষা একদিকে যেমন জীবন্ত অন্যদিকে তেমনি তীক্ষ্ণ সরসতার মাধুর্যে সিক্ত। বাংলাগদ্যের কথ্যরীতির উন্নয়ন ও উৎকর্ষের কারণে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৭৬-১৯৩৮)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসে বাঙালির জনচিত্তকে জয় করেছিলেন। তার জন্ম ১৮৭৬ সালে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান শরৎচন্দ্রের লেখাপড়া বেশি দূর এগোয়নি। অল্পবয়সে ভবঘুরে হয়ে বেঙ্গুনে যান। সেখানে চাকুরিসূত্রে বেশ কিছুকাল অবস্থান করেন। বাংলা ও বাংলার বাইরে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজকে বেশ ভালভাবে তিনি নিরীক্ষণ করতে পেরেছিলেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনীই মূলত শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লেখক আদর্শের মানুষ সন্ধান করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের রচনাদর্শ ও জীবন বাঙালি জন চিত্তকে স্পর্শ করতে পারেনি - শরৎ উপন্যাসে সাধারণ মানুষের চিত্তবিকার, ক্ষোভ ও অপূর্ণতার ব্যঞ্জনা সংবেদনশীল কাহিনীতে পরিবেশিত হয়েছে। এ ছিল বাঙালি পাঠকের কাছে নতুন। প্রতিদিনের দেখা জগৎ সংসারকে সাহিত্যে খুঁজে পেয়ে পাঠক তৃপ্ত হয়েছিল। তাই জনপ্রিয়তার দিক থেকে শরৎচন্দ্র ছিলেন শীর্ষে। সে জনপ্রিয়তা এখন সম্পূর্ন অবলুপ্ত হয়েছে - তা নয়।

শরৎচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলো হচ্ছে-

বিরাজ বৌ (১৯১৪), বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬), পল্লী সমাজ (১৯১৬), চরিত্রহীন (১৯১৭), দেবদাস (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), দেনা পাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), শ্রীকান্ত ৪ খন্ড (১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩) বিপ্রদাস (১৯৩৫)।

শরৎচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ উপন্যাসের বিষয় তিনি নির্বাচন করেছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। দ্বিতীয় কারণ তাঁর ভাষা একদিকে ছিল সহজ সরল, গতি ও আবেগময়।

বেগম রোকেয়া
(১৮৮০-১৯৩২)

বেগম রোকেয়া রক্ষণশীল মুসলিম ঘরের সন্তান ছিলেন। তাঁর পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়ার চর্চা ছিলনা। তাছাড়া ছিল কঠোর পর্দাপ্রথা। বিয়ের পরে স্বামীর সংস্পর্শে লেখাপড়ার সুযোগ পান। স্বামীর মৃত্যুর পরে কলকাতায় স্বামীর নামে। 'সাখাওয়াত গার্লস হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভেবেছিলেন মুসলিম মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার না ঘটলে মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা কাটবে না। সেজন্য নিজে মেয়েদের জন্য স্কুল গড়েছিলেন। সমাজ সংস্কার ও সমাজ অগ্রগতির জন্য নানাবিধ কাজকর্মে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে মুসলিম নারী জাগরণের জন্য তিনি কলম ধরেছিলেন।

মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী বেগম রোকেয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'মতিচুরে' রচনার সংখ্যা দশ। এখানে ইংরেজি থেকে অনুবাদও আছে। 'সুলতানার স্বপ্নে' লেখক দেখাতে চেয়েছেন - সুযোগ পেলে নারীরা রাষ্ট্রপরিচালনা থেকে সব কাজেই যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে। 'অবরোধ বাসিনীই' বেগম রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

এস ওয়াজেদ আলী
(১৮৯০-১৯৫১)

এস ওয়াজেদ আলী রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতেই লিখেছেন। তাঁর রচনাও বিচিত্রধর্মী। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী' গ্রন্থে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম মিলিত এক জাতি গড়ার কথা বলেছেন। এস ওয়াজেদ আলীর সাহিত্যে মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচনায় সর্বত্র একটি নীতিবোধ ও সৌন্দর্যবোধ কার্যকর ছিল।

এস ওয়াজেদের উল্লেখযোগ্য রচনা-

১. গল্পের মজলিশ - গল্প
২. দরবেশের দোয়া - গল্প
৩. ভবিষ্যতের বাঙ্গালী - প্রবন্ধ
৪. জীবনের শিল্প - প্রবন্ধ
৫. আকবরের রাষ্ট্রসাধনা - ইতিহাস
৬. গ্রানাড়ার শেষ বীর - ঐতিহাসিক উপন্যাস
৭. খেয়ালের ফেরদৌস - রম্যরচনা
৮. সুলতান সালাদিন - নাটক

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
(১৮৮০-১৯৩১)

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী একাধারে কবি ও গদ্য লেখক। তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি মুসলিমদের অতীতকালের শৌর্যবীর্যের পুনরাবির্ভাব কামনা করতেন। তাঁর রচিত সাহিত্যে এ মনোভাবটিই ফুটে উঠেছে। তাঁর রচনাগুলো হচ্ছে- তুরস্ক ভ্রমণ (১৯১৩), আদব কায়দা শিক্ষা (১৯১৪), স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬), 'সুচিন্তা', 'স্বজাতি প্রেম' (১৯০৯), তুর্কী নারী জীবন, স্ত্রী শিক্ষা, কারাকাহিনী (অপ্রকাশিত) প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থ ও রায়নন্দিনী (২য় সং ১৯২৮), ফিরোজা বেগম (১৯২৭), তারাসঙ্গ এবং 'নূরউদ্দীন' (২য় সং ১৯২৮), উপন্যাস।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর প্রবন্ধগুলোতে যে মুসলিম জাগরণের স্বপ্ন দেখেছেন উপন্যাসেও তাঁর দায় আছে। তবে উপন্যাসগুলো অনেকক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াজাত। বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলো উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর উপন্যাস পরিকল্পিত। এ কারণেই তাঁর উপন্যাসগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য হতে পারেনি ও শিল্পসফলও হতে পারেনি।

সিরাজীর উপন্যাসের ভাষা অলংকৃত। সংস্কৃতানুসারী সমাজবদ্ধ বড় বড় পদ ও ভাষার কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। তিনি একজন বাগ্মী ছিলেন। সে প্রভাব তাঁর রচনার ভাষাতেও বিদ্যমান।

আবুল মনসুর আহমদ
(১৮৯৮-১৯৭৮)

আবুল মনসুর আহমদ একজন রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁর কয়েকটি ব্যঙ্গগ্রন্থ বিভাগপূর্ব যুগে তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 'আয়না' ও 'ফুডকনফারেন্সে' সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃংখলাকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। Satire লেখক হিসেবে আবুল মনসুর আহমদের দান অবিস্মরণীয়। তবে তাঁর ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ কঠোর হলেও তার পিছনে ছিল স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য মর্মবেদনা। কাজী নজরুল ইসলাম আয়নার ভূমিকা "আয়নার ফ্রেমে" লিখেছিলেন - 'তাঁর ব্যঙ্গের হাসির পিছনে যে অশ্রু আছে, সে কামড়ের পিছনে যে দরদ আছে, তা যারা ধরতে পারবেন, আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের সত্যিকার রসোপলব্ধি করতে পারবেন তাঁরাই'।

ব্যঙ্গ ধর্মী রচনা ছাড়া ও আবুল মনসুর আহমদ "জীবন ক্ষুধা" ও 'আবেহায়াত' নামে দু'টি উপন্যাস লিখেছেন। এছাড়া তাঁর 'সত্যমিথ্যা' নামক আরো একটি উপন্যাস রয়েছে যেটি একটি অনুবাদ। আবুল মনসুর আহমদের একটি বিখ্যাত আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'। 'আত্মকথা' তাঁর আরো একটি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ। বিভাগপূর্ব ভারতে বেশ কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিখ্যাত 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আবুল মনসুর আহমদের 'আসমানী পর্দা' ও 'গালিভারের সফরনামা' তাঁর আরো দু'টি গল্পগ্রন্থ। উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও তাঁর বেশ কয়েকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবন্ধ গ্রন্থ রয়েছে। ছোট গল্প রচনার ভিত্তিতে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম
(১৮৯৯-১৯৭৬)

কাজী নজরুল ইসলামের প্রধান পরিচিতি কবি হলেও তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। উপন্যাস ছাড়াও গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি। 'বাঁধনহারা' - নজরুল ইসলামের পত্রোপন্যাস। প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। 'মৃত্যুক্ষধা' ১৯৩০ সালে। নজরুল ইসলামের প্রথম গল্পগ্রন্থ (ব্যথার দান) প্রকাশিত ১৯২২ সালে। 'রিক্তের বেদন' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩২ সালে। নজরুলের তিনটি উপন্যাসেই সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে দেশ প্রেমের ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা আন্তরিকতাপূর্ণ ও গতিশীল। গল্পগ্রন্থগুলির প্রধান আবেদন প্রেম। নজরুল ইসলাম মূলত কবি ও সঙ্গীত শিল্পী হলেও তাঁর গদ্যরচনা নিজস্ব প্রভায় উজ্জ্বল।

নজরুল সাংবাদিকও ছিলেন। তিনি 'ধুমকেতু', 'নবযুগ', লাঙল প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এ পত্রিকাগুলিতে প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ তিনি লিখেছেন। দৈনিক নবযুগে প্রকাশিত কতিপয় সম্পাদকীয় 'যুগবানী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'ধুমকেতুতে' প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ নিয়ে দুর্দিনের যাত্রী প্রকাশিত হয়। 'রুদ্রমঙ্গল' একটি ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধ পুস্তক। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নজরুলের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান
(১৮৭৮-১৯২৩)

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস 'আনোয়ারা'। জনপ্রিয়তা যদি সার্থকতার নামান্তর হয় তবে উপন্যাসটি অবশ্যই সার্থক। নজিবর রহমানের সমসাময়িককালে অনেকেই উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু তাঁর মত এত জনপ্রিয়তা কেউ পাননি। মুসলিম পরিবারের সাধারণ জীবন কাহিনী 'আনোয়ারা' উপন্যাসের বিষয়। সমাজে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বহুবিবাহের কুফল, স্ত্রৈণতা, স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা, বংশ গরিমার অন্ত:সারশূন্যতা ইত্যাদি লেখক চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর মূলকাহিনী পল্লবিত হয়েছে আনোয়ারা ও নূরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে। 'আনোয়ারা' ছাড়া নজিবর রহমান আরও কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে- 'প্রেমের সমাধি', 'পরিণাম', 'হাসান গঙ্গা বাহমনি', 'দুনিয়া আর চাই না', 'গরীবের মেয়ে'।

আবুল ফজল
(১৯০৫-১৯৮১)

আবুল ফজলের সাহিত্যে আবির্ভাব ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে। তবে পরবর্তীকালে তিনি প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। 'চৌচির' ১৯৩৪), সাহসিকা (১৯৪৬), জীবন পথের যাত্রী (১৯৪৮) এবং রাঙা প্রভাত (১৯৫৭) তাঁর রচিত উপন্যাস। 'মাটির পৃথিবী' (১৯৪০), আয়েষা (১৯৫১), গল্পগ্রন্থ দুটি পাঠকমহলে পরিচিতি লাভ করেছিল। আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় (১৯৬৪) সালে।

'রাঙা প্রভাত' উপন্যাসে সম্ভবত আবুল ফজলের সাফল্য বেশি। নায়ক কামালের জীবনোপলব্ধি আসলে লেখকের নিজেরই জীবনোপলব্ধি। 'চৌচির' ও 'জীবনপথের যাত্রী'তে সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করি। তবে আবুল ফজলের নিজস্ব আদর্শ প্রতিফলিত করতে গিয়ে উপন্যাসগুলো অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আবুল ফজল একজন চিন্তাবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলীর সাহায্যে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনা প্রবন্ধগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থগুলো হচ্ছে- বিদ্রোহী কবি নজরুল (১৯৫১), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬০), সাহিত্য, 'সংস্কৃতি ও জীবন', শুভবুদ্ধি (১৯৭৪), সমকালীন চিন্তা (১৯৭৪) এবং সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৪)।

'রেখাচিত্র' নামে আবুল ফজলের একটি আত্মজীবনীমূলক রচনাও আছে।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
(১৮৯৮-১৯৭৬)

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ দার্শনিক প্রবন্ধ লিখে সাহিত্য জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলায় পারস্য সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ। পারস্য প্রতিভা (১ম খন্ড) ও পারস্য প্রতিভা (২য় খন্ড) যথাক্রমে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সনে প্রকাশিত হয়। এ দুটি গ্রন্থেই পারস্যের ব্যাতনামা কবিদের জীবন ও সাহিত্য, সুফিমত ইত্যাদি তুলে ধরেন। 'মানুষের ধর্ম' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সনে। বরকতুল্লাহর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে - কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত (২য় সং ১৯৬৫), নবীগৃহ সংবাদ এবং 'নয়াজাতি স্রষ্ট হযরত মুহম্মদ' (১ম সং ১৯৬৩), রচনা করেন। এসব গ্রন্থে লোকের ইসলামি ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা ধরা পড়ে।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ চমৎকার সাধুভাষা লিখেছেন। বিশেষ করে 'পারস্য প্রতিভা' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর অনায়াস সাবলীল রচনাভঙ্গি পারস্য সাহিত্য ও এর দার্শনিকতাকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখাগোষ্ঠী

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন আবুল হুসেন। তার সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কাজী আব্দুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেন। এ সমাজের মুখপাত্র ছিল 'শিখা' নামে একটি পত্রিকা। এ সমাজের উদ্দেশ্য ছিল মুক্ত মন নিয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চা। জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করতে হবে এবং সকলকিছুকে যুক্তির মাপকাঠিতে দাঁড় করিয়ে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে। র‍্যাশনালিষ্ট ও হিউম্যানিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তাঁদের আদর্শ। মাত্র বছর দশেক এ সমাজ চালু ছিল। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃস্টি করেছিল। "বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা", 'বাঙলার বলশী', 'হিন্দু-মুসলিম' (নাটক), 'মুসলিম কালচার' (অনুবাদ) গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া আবুল হুসেন 'আদর্শের নিগ্রহ, নিষেধের বিড়ম্বনা, 'শতকরা পয়তাল্লিশ' নামে তিনটি উল্লেখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। কাজী আবদুল ওদুদের নবপর্যায় গ্রন্থে 'সম্মোহিত মুসলমান' নামে প্রবন্ধ লেখেন। কাজী মোতাহার হোসেন 'আনন্দও মুসলমান গৃহ', 'সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান', 'বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এসবগুলিতেই মুক্ত মন ও মানসিকতার পরিচয় আছে। এঁরা নানা সংস্কার ও গোঁমিতে আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের মুক্তি চেয়েছিলেন মনে প্রাণে। মুক্তবুদ্ধি ও মুক্ত মনের চর্চা করতে যেয়ে শিখা গোষ্ঠীর সদস্যারা নানা নির্যাতন ও প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদের গ্রন্থসমূহের তালিকা-

শাশ্বত বঙ্গ (১৩৫৮)
কবিগুরু গ্যেটে (দুখন্ড)
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
বাংলার জাগরণ
শরৎচন্দ্র ও তারপর
নজরুল প্রতিভা
মীর পরিবার (গল্প)
তরুণ (গল্প)
নদীবক্ষে (উপন্যাস)

আজাদ (উপন্যাস)
হযরত মুহম্মদ ও ইসলাম

কাজী আবদুল ওদুদ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উদার মানবতাবাদকে আদর্শ হিসেবে বহন করেছেন এবং তাঁর লেখনীতে সেই ভাবটিই মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী
(১৯০৩-১৯৫৬)

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও 'শিখা গোষ্ঠীর' আলোকে আলোকিত একজন লেখক। সারাজীবন তিনিও মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরী লিখেছেন কম। কিন্তু এর কোনটিরই গভীরতা কম নয়। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে - সভ্যতা (ক্লাইভ বেলের সিভিলাইশেন -এর অনুবাদ)।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনায় তাঁর যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন।
২. সংক্ষেপে বাংলা গদ্য সৃষ্টিতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান লিখুন।
৩. বাংলা গদ্যে রাজা রামমোহনের অবদান সম্পর্কে লিখুন।
৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাগুলির পরিচয় দিন।
৫. প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্য-সেবার পরিচয় দিন।
৬. বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন।
৭. বাংলা গদ্যের বিকাশে রবীন্দ্রনাথের অবদানের মূল্যায়ন করুন।
৮. মীর মশাররফ হোসেরন সাহিত্যকৃতি আলোচনা করুন।
৯. টীকা লিখুন- অক্ষয় কুমার দত্ত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বেগম রোকেয়া।

বাংলা কবিতা

ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা কবিতার বিষয়, রীতি ও শিল্প ও আদর্শগত খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। মধুসুদনের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত কাব্যের চর্চা হয়েছে অনেকটা গতানুগতিক ধারায়। তবে নতুন যুগের হাওয়া লাগতে শুরু করেছে - আর তাতে পাল্টে যাচ্ছে সাহিত্য শিল্পের ধ্যান ধারণা। কিন্তু প্রথমেই সূচিত হয়েছিল গদ্যের পালাবদল। ফলে বাঙালি লেখক-পাঠক তখন গদ্য নিয়েই ব্যস্ত। ভাঙ্গাগড়ার সেই সব দিনে বাংলা কাব্যের প্রতিভূ ঈশ্বরগুপ্ত। পুরাতন দিনকে তিনি পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারেননি - নতুনকেও গ্রহণ করতে পারেননি পুরোপুরি।

ঈশ্বর গুপ্ত
(১৮১২-১৮৫৯)

ঈশ্বর গুপ্ত কবি ও সাংবাদিক। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নাম “সংবাদ প্রভাকর”। সাংবাদিকতার জন্য রচনা সাধারণত স্বল্পায়ু হয় - সাহিত্যের জন্য রচনা হয় দীর্ঘায়ু। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের কবির স্বাভাকি প্রতিভা থাকলেও তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা খুব বেশিদূর এগোয়নি। তাছাড়া স্বল্পকালের সাহিত্যিক মূল্যবোধের ঊর্ধ্বেও তিনি উঠতে পারেন নি। ফলে তাঁর অধিকাংশ কবিতাই বর্তমানের প্রয়োজন মিটিয়েছে - ভবিষ্যতের প্রয়োজন তাতে খুবই কম। তবে সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্তের একটি বড় অবদান, সমকালের অধিকাংশ কবি সাহিত্যিক, যেমন- বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়সহ অনেকেই তাঁর সংবাদ প্রভাকরে লিখে হাত পাকিয়েছিলেন।

ঈশ্বরগুপ্ত আধুনিক কালের অনেক সামাজি, রাজনৈতিক পরিবর্তনকেই সমর্থ করেননি। যেমন- বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলন, ইয়ং বেঙ্গলের উগ্রতার নিন্দা করছেন, বিলাতী ধরনের নারী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন না। তিনি সেকালের সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন না করে ইংরেজের স্তুতিবাদ করেছেন। এর উল্টোপিঠে আমরা দেখতে পাই ‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের’ প্রতিষ্ঠাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশে এরকম একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী করেছিলেন তাঁর পত্রিকায়। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী শিক্ষার বিরোধীও ছিলেন না ঈশ্বর গুপ্ত। ইংরেজ সরকারের যথেচ্ছ কর ধার্য করার নীতির তিনি সমালোচনা করেছিলেন। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারেও উদার ছিলেন। দেশপ্রেম, স্বাদেশিকতা তাঁর কবিতাতেই আমরা প্রথম লক্ষ্য করি। এই বিবিধ পরিচয়ের মিশ্রণ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি। ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের সময় কবিগান, আখড়াই এগুলোর প্রচলন ছিল। ভারতচন্দ্রের পুরাতন রীতি তখনও ক্রিয়াশীল। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালি সমাজের জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ করে হাস্য-পরিহাসের যে যোগান সেদিন দিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি কিছু করার সম্ভাবনা ছিল না।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাগুলিকে আমরা প্রকৃতি, ঈশ্বর তত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, স্বদেশ প্রেম, নারী প্রেম ও সমসাময়িক ঘটনা এই ছয় ভাগে ভাগ করতে পারি। তাঁর নারীপ্রেম ও নীতিতত্ত্ব বিষয়ক কবিতাগুলি কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলিতে পরাধীনতার গ্লানি এবং ভবিষ্যতের গৌরবময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ বিষয়টি আধুনিক। তবে ঈশ্বর গুপ্তের খ্যাতি সমাজের পটভূমিকায় সমকালীন ঘটনার ব্যঙ্গ বিদ্রুপমূলক কবিতার জন্য। এই ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের জন্য আজও বাংলা সাহিত্যসেবীদের কাছে স্মরণীয়। তাঁর ব্যঙ্গের কিছু নমুনা উদ্ধৃত হল।

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের প্রতি বিদ্রুপ-

“যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ, বি, শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে”

ইয়ং বেঙ্গলদের প্রতি ধিক্কার-

“যত কালের যুবো　　যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে;
ধোরে গুরুপুরুত　　মারে জুতো
ভিখারী কি অন্ন পাবে?”

এরকম আরও অনেক হাস্য-পরিহাস আছে যা আজও উপভোগ্য। জীবনের লঘু দিকের উপর তাঁর কখনও কখনও দৃষ্টি পড়েছে। ‘পাঁঠা’, ‘আনারস’, ‘তপসে মাছ’ প্রভৃতি কবিতায় তাঁর হাস্যরস মধুর ছবিটি লক্ষ্য করি। সহজ রসের প্রসন্নতা তাঁর কবিতাকে স্নিগ্ধ করেছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪-১৮৭৩)

বাংলা গদ্যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছেল ১৮৪৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ প্রকাশের মাধ্যমে। আর বাংলা কবিতায় নতুন যুগের সূচনা হল ১৮৫৯ সালে মধুসূদন দত্তের তিলোতমা কাব্যে প্রকাশের মাধ্যমে। ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতিতে ছিল এক সন্ধিযুগের অস্থিরতা। মধুসূদনের আবির্ভাবে সে অস্থিরতা কেটে নতুন সূর্যোদয় হল।

যথার্থ অর্থেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে এক বিপ্লবী কবি। রচনাদর্শ ও প্রাণচাঞ্চল্যে তিনি বহুদিনের নিগড়ে বাঁধা বাংলা কবিতাকে মুক্তি দেন। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের গতিপথই শুধু পরিবর্তন করলেন না একে বহুগুণে বিস্তৃতও করলেন। এ কথা সত্য তিনি প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস রামায়ণ মহাভারত থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু জীবনবোধ সম্পূর্ণ আধুনিক ও পাশ্চাত্য থেকে আহরিত। কাহিনী নির্মাণ, চরিত্রসৃষ্টি, শব্দ ও উপমা প্রয়োগের কৌশল ও দক্ষতা মধুসূদন অর্জন করেছিলেন ইউরোপের বিখ্যাত কবিবৃন্দ- হোমার, ভার্জিল, দান্তেও মিল্টন থেকে। বিদেশী জীবন ও সংস্কৃতিকে যেমন সাহিত্যে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি নিজ জীবনেও গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুত্ব ও ভারতীয় সবকিছুকে একসময় তিনি ঘৃণা করেছেন। কৈশোরে ও নব্যযুবক মধুসূদন দত্তের উচ্চাশা ছিল তিনি ইংরেজি ভাষায় মহৎ কবি হবেন। এ সময়ের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন-

“I sigh for Albion’s distant shore,
It`s villages green, its mountains high;
Tho` friends, relations I have none
In that fair clime, yet oh` I sigh
To cross the vast Atlantic Wave
For glory or a nameless grave”.

মাদ্রাজে অবস্থানকালে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদনের Captive cady নামে ইংরেজিতে লিখিত কাব্য প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে ‘The visions of the past’ নামে অসম্পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে লেখা এ কাব্যগুলি স্বদেশীদের কাছে প্রশংসিত হলেও বিদেশীদের কাছে ততটা হয়নি এবং এঁদের কেউ কেউ মধুসূদনকে তাঁর মাতৃভাষায় কাব্যচর্চা করার অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের যোগাযোগ ঘটে আকস্মিকভাবে। রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘রত্নাবলী’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মধুসূদন ও সে সুবাদে অভিনয় দেখেন। ‘রত্নাবলী’ নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদনের বাংলা নাটক লেখার ইচ্ছা জাগে। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়ম-রীতি ভেঙ্গে পাশ্চাত্যরীতিতে ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক রচনা করেন। মধুসূদনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘তিলোত্তমা’ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি “মেঘনাদ বধ কাব্য” ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। ‘মেঘনাদ বধ’ বাংলা সাহিত্যে একমাত্র সার্থক মহাকাব্য। এ মহাকাব্যের কাহিনী মধুসূদন গ্রহণ করেছেন রামায়ণ থেকে। তবে সংস্কৃত মহাকাব্য রচনার আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রীতিই ছিল তাঁর আদর্শ। বিশেষ করে স্টাইল ও রচনাশৈলীগত ঋণ গ্রীক ও ইউরোপীয় সাহিত্যের কাছে। বিষয়ের অনুরূপ ভাষা নির্মাণ, বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও উদারতা, মানব ভাগ্যের নিপুণ চিত্র এসবই মধুসূদনের কাব্যে এসেছে ইউরোপীয় আদর্শের মহাকাব্যের প্রাণধর্ম হিসেবে।

মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা মহৎ কাব্যের লক্ষ্মণকে অনুভব করি। মহাকাব্যের নায়কের জীবনোপলব্ধির যে পূর্ণতা তা মেঘনাদ বধে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম সর্গেই রাবণ সমুদ্রকে লক্ষ্য করে যে অভিমান এবং আক্ষেপ করেছেন তার মধ্যে যেমন ক্ষণকালের বৈকল্য আছে তেমনি উপমা ভাষার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্নিবার প্রত্যয়ও ঘোষিত হয়েছে। জীবনের চাঞ্চল্য, গতি ও বলিষ্ঠতা সর্বোতভাবে এখানে প্রকাশিত হয়েছে। রাবণ তার সর্বনাশকে লক্ষ্য করছে কিন্তু তাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তার নেই। দ্বন্দ্ব ও সর্বনাশের মধ্যে জীবনের জয়ধ্বনি মেঘনাদ বধ কাব্যে ঘোষিত হয়েছে।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হয়। মধুসূদন এ কাব্যে ইতালির কবি ওভিদের Herodies কাব্যের অনুকরণ করেছেন। ওভিদ পত্রের সাহায্যে তার নায়ক-নায়িকার চিত্তের প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন। বীরাঙ্গনা সর্বমোট একুশ পত্রের সাহায্যে মধুসূদন কাব্যটি রচনা করেছেন। 'দুস্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' এ জাতীয় পত্র রচনা করেছেন।

১৮৬৫ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থানকালে মধুসূদন দত্ত এক শতেরও বেশি সনেট রচনা করেন। ১৮৬৬ সনে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে এগুলো প্রকাশিত হয়। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এর অনুকরণে চৌদ্দপংক্তির মধ্যে ভাবকে সংহত করে কবি এ সনেটগুলি রচনা করেন। এ সনেটগুলির বেশ কয়েকটিতেই কবির জন্মভূমি বা মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ভালবাসা ফুটে উঠেছে। এ ভালবাসা যে কত গভীর তারই একটি উদাহরণ–

"হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন,–
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মন:
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,–
ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মনিজালে।"

প্রকৃতপক্ষে এই সনেটগুচ্ছই কবির শেষ কাব্য রচনা। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে যে অভিনব দানে সমৃদ্ধ করেছিলেন তার আরেকটি হচ্ছে অমিত্রাক্ষর ছন্দ। পুরাতন কালের বাংলা পয়ারকে ভেঙে ছন্দকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভবেই' এর পরীক্ষা করেছিলেন। পরবর্তী কাব্যসমূহ অর্থাৎ মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা ও 'চতুর্দশ কবিতাবলী' তে সে পরীক্ষারই সার্থক রূপায়ন আমরা লক্ষ্য করি। ইংরেজি Blank verse এর আদর্শ কবিকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিল। পয়ার বিলম্বিত লয়ের ছন্দ। কিন্তু চিমে-তেতালার ঢং এর মধ্যেই মধুসূদন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। পূর্বের সকল কবিই ছন্দযতি ও কণ্ঠবিরতি একইস্থানে রাখতেন। কিন্তু অমিত্রামার চরণের অন্ত্যমিলকে বর্জন করল - একই সঙ্গে ছন্দকে অর্থের এবং কণ্ঠধ্বনির অনুগামী করল। ফলে ছন্দের স্বাধীনতা গদ্যের ভঙ্গিতে অনেকটা বেড়ে গেল। ইংরেজি কাব্যে verse উদ্ভাবনার কৃতিত্ব মার্লোর, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণের কৃতিত্ব তেমনি মধুসূদন দত্তের। মেঘনাদ বধ ও বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।

মহাকাব্যের ধারা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সার্থক মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ' রচনার পর অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করে মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মহাকাব্যের সার্থক দৃষ্টান্ত আর কেও স্থাপন করতে পারেননি। এর কারণ গীতিকবিতার আবির্ভাব এবং মহাকাব্য রচয়িতাদের সামর্থ্যের অভাব। তবুও বিশ শতক পর্যন্ত মহাকাব্য রচনার প্রয়াস চলেছে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, যোগেন্দ্র নাথ বসু পর্যন্ত অনেকেই মহাকাব্য রচনা করেছেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮৩৮-১৯০৩)

হেমচন্দ্র যখন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন তার আগেই বাংলা সাহিত্যে গদ্যে ও কাব্যে, নাটকে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে। মধুসূদন তাঁর যুগান্তকারী কাব্য রচনা সম্পন্ন করেছেন এবং বাংলা কাব্যে এক প্রাণবন্ত যুগের সূচনা করেছেন। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের কয়েকজন কবি মধুসূদনের প্রাণধর্মকে অনুভব না করেই মধুসূদনকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। এ অক্ষম

অনুসরণ সঙ্গত কারণেই বাংলা কাব্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। মধুসূদনকে অক্ষমভাবে অনুসরণ যাঁরা করেছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের একজন। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে 'বৃত্রসংহার' কাব্যটি রচিত। কিন্তু মধুসূদনের কৃতিত্ব হেমচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় না। যদিও এ মহাকাব্যটি হেমচন্দ্রকে সেকালে কিছুটা জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। বৃত্রের স্বর্গ অধিকার করার পর দেবতাগণ কিভাবে স্বর্গ পুনরুদ্ধার করলেন ও বৃত্রের পতন হল এটাই এ মহাকাব্যের কাহিনী। বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে বিবেচিত হয়।

কবি হেমচন্দ্র রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বীরবাহু' ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। 'চিন্তাতরঙ্গিণীর' তুলনায় 'বীরবাহু' কাব্যটি পরিণত। কবি হেমচন্দ্রের তৃতীয় রচনা 'আশাকানন' একটি রূপক কাব্য।

নবীনচন্দ্র সেন

(১৮৪৭-১৯০৯)

নবীনচন্দ্র সেন কর্মজীবনে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। হেমচন্দ্রের মত নবীনচন্দ্রও সমকালে কবি হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। নবীনচন্দ্র সেনের খন্ডকাব্য 'অবকাশ রঞ্জিনী' ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ সালে পাঁচ সর্গে সমাপ্ত 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এটি একট আখ্যায়িকা কাব্য। 'রঙ্গমতী', 'ক্লিওপেট্রা' এ দুটিও আখ্যায়িকা কাব্য। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার ভাগ্যবিপর্যয় এবং পরাধীনতার কাহিনী আছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিজয়ে কবি উল্লসিত হয়েছেন। 'রঙ্গমতি' কবি কল্পনাজাত একটি রোমান্টিক সৃষ্টি। রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬) নামক ত্রয়ী কাব্য রচনা করে নবীনচন্দ্র খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। এটি হিন্দু পুনর্জাগরণমূলক মহাকাব্য।

কায়কোবাদ

(১৮৫৮-১৯৫২)

কায়কোবাদের জীবনের অর্ধাংশ বিংশ শতাব্দীতে বিস্তৃত হলেও তিনি মূলত উনিশ শতকেরই কবি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গেই তাঁর নৈকট্য বেশি।

কবি কায়কোবাদের কাব্য সাধনাকে আমরা মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্যায় গীতিকাব্যের, দ্বিতীয় পর্যায় মহাকাব্যের ও তৃতীয় পর্যায় বৈচিত্র্যের পর্যায়। কায়কোবাদের প্রথম পর্যায়ে আমরা 'বিরহ বিলাস' (১৮৭০), কুসুমকানন (১৮৭৩), অশ্রুমালা (১৮৯৪) -এ তিনটি কাব্য পাই। প্রথম দুটি কাব্যে অল্পবয়স্ক কবির প্রবল কোন অনুভূতি ধরা পড়ে না। 'অশ্রুমালাতেই' কবির আন্তরিক ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। 'বিরহ বিলাস' ও 'কুসুম কানন' ভাষা সহজ ও অলঙ্কারহীন। অশ্রুমালার কবিতাগুলিতে প্রণয়ের ব্যর্থতা ও ক্রন্দন আমরা লক্ষ্য করি। যে সময়ে ও কালে কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হয় তখন ও আধুনিক কালের কোন মুসলিম কবির আবির্ভাব হয়নি। সেদিক থেকে 'অশ্রুমালা' কাব্যের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক সার্থকতা আছে। নবীনচন্দ্র সেন 'অশ্রুমালা' সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন- "মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার, না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না; অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে।"

দ্বিতীয় পর্যায় কায়কোবাদের মহাকাব্যের পর্যায়। ১৯০৪ সালে তাঁর 'মহাশ্মশান' প্রকাশিত হয়। লেখক বিভিন্নভাবে জানিয়েছেন মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী রচনাই তাঁর 'মহাশ্মশান' কাব্যের উদ্দেশ্য। কবি ঐতিহাসিকতার দিক থেকে মহাশ্মশানকে মৌলিক মহাকাব্য বলেছেন।

কায়কোবাদের মহাশ্মশান পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে লিখিত। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লিখিত হলেও মানবিক প্রণয় ও আবেগ কাহিনীকে একঘেয়ে করে তোলেনি। হিন্দু-মুসলিমের যুদ্ধ কাহিনী কবি বর্ণনা করেছেন - কিন্তু তিনি কোথাও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দেননি। কায়কোবাদের কাব্যজীবনের শেষ অধ্যায় বিচিত্র কাব্যসাধানার কাল। ১৯১৫ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এসময় তিনি বেশ কিছু খন্ডকাব্য, কাহিনীকাব্য, মহাকাব্য এবং গীতিগুচ্ছ রচনা করেছেন। এ পর্যায়ের কাব্যগুলির নাম - শিবমন্দির (১৯১৭), অমিয় ধারা (১৯২৩), শ্মশান ভস্ম (১৯২৪), মহররম শরিফ (১৯৩৩) ইত্যাদি। এ সময়ের কাব্যগুলির মূলসুর ধর্মবোধ ও স্বাজাত্যপ্রীতি। কাব্যগত সৌন্দর্যের চেয়ে ইতিহাসের সত্যকে তিনি বেশি অনুসন্ধান করেছেন।

কায়কোবাদের কবিতার প্রকাশভঙ্গি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তাঁর কবিতায় কোন জটিলতার সন্ধান পাওয়া যায় না।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

(১৮৭৯-১৯৩১)

শুধু সাহিত্যপ্রীতির কারণে নয়, জাতির কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'অনল প্রবাহ' ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে প্রথম সংস্করণে নয়টি খন্ড কবিতা ছিল। কবি এ কাব্যে মুসলমানদের হীন অবস্থার কথা চিন্তা করেছেন ও ইংরেজদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 'অনল প্রবাহে' হেমচন্দ্রের কবিতার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইসলামি পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী কবি সিরাজী মুসলিম তরুণদের উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। এ কাব্যে শব্দব্যবহার ও কবিতার শৈলীতে সিরাজীর মনোনিবেশের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

'স্পেন বিজয় কাব্য' এবং 'মহাশিক্ষা' কাব্য সিরাজীর দুটি কাব্যগ্রন্থ। 'স্পেনবিজয় কাব্যে' মুসলিম বীর তারেকের সঙ্গে স্পেনের সম্রাট রড়ারিকের যুদ্ধ ও সংগ্রামের কাহিনী বর্নিত হয়েছে। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের অনুসরণ আমরা এ কাব্যে লক্ষ্য করি। 'মহাশিক্ষা' কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে রচিত। অনেক অনৈতিহাসিক কাহিনী এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এখানেও কবির উদ্দেশ্য জাতীয় উন্নয়ন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮২৭-১৮৮৭)

রঙ্গলাল ইংরেজি-শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্য সাধনায় আধুনিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি কাব্যে প্রাচীন ভারতের পুনর্জাগরণ কামনা করেছেন। রঙ্গলালের কাব্যে ইংরেজদের প্রশস্তি ও মুসলমানদের প্রতি বিরূপতার পরিচয় আছে। রঙ্গলাল টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে পদ্মিনী, কর্মদেবী ও শূরসুন্দরী কাব্য তিনটি রচনা করেন। 'কাঞ্চী কাবেরী' উড়িষ্যার ইতিহাস অবলম্বনে রচিত রোমান্টিক কাহিনী। রঙ্গলাল কালিদাসের কুমারসম্ভরের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত অনুবাদ করেছিলেন।

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে বাংলা গীতি কবিতার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও গীতি কবিতা ছিল। চর্যাপদের পদগুলি, বৈষ্ণব কবিতার কবিতাগুলি প্রকৃত পক্ষে গীতিকবিতাই। কিন্তু আধুনিক কালের গীতিকবিতা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। মধ্যযুগের সমাজ ছিল ধর্মনির্ভর। সেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি ছিল মূল্যহীন - সমষ্টিগত উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। ফলে চর্যাগীতি, বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ, বাউল গান ব্যক্তির সৃষ্টি হয়েও সমষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত। আধুনিক গীতিকবিতার যে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য তা মধ্যযুগে ছিল না।

আধুনিক যুগের সূচনাকালেও আমরা দেখেছি মহাকাব্যে রচনার প্রাবল্য। কিন্তু পাশাপাশি আধুনিক গীতিকবিতাও তার স্থান করে নিতে শুরু করেছে। তবে বিহারীলালের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত গীতিকবিতার একাধিপত্যের যুগ শুরু হয়নি।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

(১৮৩৫-১৯৯৪)

বিহারীলাল আধুনিক বাংলা গীতি কবিতার উদ্গাতা। কৈশোরে ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে বিহারীলালকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। যখন বাঙালি পাঠক মহাকাব্যের মোহে মুগ্ধ তখন নিতান্ত নিভৃতে বিহারীলালের কাব্য সাধনা চলছিল। বিহারী লালের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রিকায় (১৩০১) প্রথম তাঁর কাব্যসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ও কাব্যের মূল সুর শিক্ষিতজনকে ধরিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে বলেছিলেন "ভোরের পাখী"। "ভোরের পাখী"র মতই সবার আগে বিহারীলালের কণ্ঠে গীতিকবিতার সুর জেগে উঠেছিল। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নাম সঙ্গীত শতক (১৮৬২), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭১), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), সাধের আসন (১৮৮৮-৯৯)। এ কাব্যগুলোর মধ্যে অনুভূতিপ্রবণ, সৌন্দর্যপিপাসু, ব্যক্তিসত্তা অনুভব করা যায়। প্রেম, সৌন্দর্য ও নিসর্গ বিহারীলালের কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছিল।

বিহারীলালের কাব্যে প্রথম আত্মনিষ্ঠ প্রকৃতিচেতনার প্রকাশ দেখা যায়। এর আগেও বাংলা কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা ছিল কিন্তু কিন্তু তা ছিল জড়প্রকৃতির বর্ণনা। বিহারীলালের কাব্যে প্রথম নিসর্গ সজীব মূর্তি নিয়ে বিকশিত হল। "নিসর্গ সন্দর্শন" কাব্যে বিহারীলালের এ মনোভাব প্রস্ফুট। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে আধুনিক যান্ত্রিকতার বদলে উদার প্রকৃতির কমনীয়তা ফিরে পেতে চেয়েছেন। প্রকৃতি চেতনার

সঙ্গে প্রেম ও সৌন্দর্যের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। কবি গৃহজীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যে নারী সৌন্দর্যকে প্রেম ও প্রীতির মধ্যে আবিষ্কার করেছেন।

'সারদামঙ্গল' বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য। তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সারদামঙ্গলে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে অন্য কাব্যে তেমন নয়। কবি জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতি এতে প্রকাশিত হয়েছে। দেবী স্বরস্বতীর সঙ্গে কবির বিরহ-মিলনের সম্পর্ক বর্ণনাই এখানে প্রধান বিষয়। কবির সারদা তাঁর মানসলক্ষ্মী এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের আধার।

'সাধের আসন' কাব্যটি আসলে 'সারদামঙ্গলের' উপসংহার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি সুদৃশ্য কার্পেটের আসন বুনে কবিকে উপহার দিয়েছিলেন। এতে সারদামঙ্গলের থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হয়েছিল। সেই কবিতাংশে একটি প্রশ্ন ছিল। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার পরে ব্যথিত কবি সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন 'সাধের আসন' কাব্যে। সারদামঙ্গলের রোমান্টিক সৌন্দর্য ও মিস্টিক তত্ত্বের টীকা ও ভাষ্য দিয়েছেন এ কাব্যে। কবির ব্যক্তিগত বেদনা, অনুরাগ ও স্বীকারোক্তির জন্য কাব্যটির একটি আলাদা মূল্য আছে।

বিহারীলালের কবিতা সযত্নলালিত নয়। তবে তাঁর প্রধান অবদান গীতি কবিতার নতুন পথ নির্মানে। এজন্যই বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেণ।

অক্ষরকুমার বড়াল
(১৮৭০-১৯১৯)

অক্ষয়কুমার বড়ালের কবি মানস প্রেম ও সৌন্দর্যলোকে অনন্তবিহারী ছিল। বাস্তব জীবনে অত্যন্ত সতর্ক সাংসারিক বুদ্ধির পরিচয় দিলেও ভাবজীবনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ন মুক্ত। তার কাব্যের প্রধান বিষয় প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও প্রেম। এ বিষয়ে তিনি বিহারীলালের অনুসারী ছিলেন। নিসর্গ চিত্র নির্মাণে তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জলি (১৮৮৫) এবং ভুল (১৮৮৭) কাব্য তিনটিতে প্রেম বিষয়ক কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে। কবি দৈনন্দিন জীবনের অবস্থান থেকেই প্রেম ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। 'শঙ্খ' (১৯১০) কাব্যে প্রেমকে প্রাত্যহিক জীবনেই উপলব্ধি করেছেন।

অক্ষয় কুমার বড়ালের সর্বশেষ কাব্য এষা (১৯১২)। এটিকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শোককাব্য বলা যায়। এ কাব্যেই মনন, হৃদয় ও শিল্পচেতনার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই 'এষা' কাব্যটি রচিত। মৃত্যুর পরে দিব্য আলোকে ঃ মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমকে উপলব্ধি করেন। এষাকাব্যে একদিকে মর্ত্যজীবনের গভীর বেদনা এবং মৃত্যু পরবর্তী অমৃতরূপী অশোক সান্ত্বনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বিহারীলালের অনুসারী হলেও অক্ষয়কুমার বড়াল ভাষা ও ছন্দ প্রকরণে বিহারীলালের সমকক্ষ নন।

গোবিন্দ চন্দ্র দাস
(১৮৫৪-১৯১৮)

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস স্বভাব কবি নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর কবিতায় তীব্র জীবনবোধ, আকণ্ঠ মর্ত্য পিপাসা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে গোবিন্দ চন্দ্র দাস অত্যন্ত দরিদ্র ও ভাওয়ালের তৎকালীন ক্ষমতাধর শাসকদের দ্বারা বিভিন্নভাবে নিপীড়িত হয়েছিলেন। কবির ব্যক্তিগত দুঃখ, রোমন্টিক চেতনা ও নিসর্গ প্রীতি তাঁর কাব্যকে অনন্যতা দান করেছে। তাঁর প্রধান কাব্য 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), কুঙ্কুম (১৮৯২), কস্তুরী (১৮৯৫), এবং ফুলরেণু (১৮৯৬)। গোবিন্দ চন্দ্র দাসের কবিতায় স্বদেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। তাঁর কবিতার আরেকটি সুর - তীব্র দেহানুরাগ। "আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংসসহ" - এ গোবিন্দদাসেরই উচ্চারণ।

উনিশ শতকে আমরা বেশ কয়েকজন মহিলা গীতিকবি পাই। এঁদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৫-১৯২৮), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯০৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) এবং স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৬৫-১৯৩২) কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী ঘরোয়া বিষয় অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেছেন। অশ্রুকর্ণা (১৮৮৭), আভাষ (১৮৯০), অর্ঘ্য (১৯০২) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য।

কামিনী রায় বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট গীতিকবি। তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য গীতিকবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আলোছায়া, পৌরাণিকী, মাল্য নির্মাল্য প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য সঙ্কলন। তাঁর বহু কবিতা একদা স্কুল পাঠ্য ছিল ও বহু পংক্তি মুখে মুখে ফিরত।

মানকুমারী বসু ‘প্রিয় প্রসঙ্গ’, ‘কাব্য কুসুমাঞ্জলি’, ‘বীরকুমার বধ কাব্য প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। সহজ গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ ও স্বামী বিয়োগের ব্যথা তার কবিতা চর্চার উৎস।

রবীন্দ্রনাথের জ্যোষ্ঠা ভাগনী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) সরোজকুমারী দেবী প্রভৃতি আরও কিছু মহিলা কবি প্রশংসনীয় গীতি কবিতা রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ
(১৮৬১-১৯৪১)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এমন কোন দিক নেই যা রবীন্দ্রনাথের যাদুকরী স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়নি। এককভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যকে প্রাদেশিক সাহিত্য থেকে আন্তর্জাতিক সাহিত্যে রূপান্তরিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের শুরু উনিশ শতকে ও বিস্তৃত বিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত। দুই শতাব্দীর ঐতিহ্যকে ধারণ করে রবীন্দ্রসাহিত্যে যে বিপুল ও বিস্ময়কর ফসল ফলেছে, তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে পাওয়া ভার। আমাদের বর্তমান পাঠের আলোচনা রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে।

ঠাকুরবাড়ীর অভিজাত ও মার্জিতরুচির পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ লালিত-পালিত হয়েছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাদেশিকতা ও শিল্পসাহিত্যের একনিষ্ঠ চর্চার কেন্দ্রভূমি তখনকার ঠাকুর পরিবার ছিল রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত লালনক্ষেত্র। বাঁধধরা শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল না। পিতার সাহচর্যে অনেকাংশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়েছিল। বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর উৎসাহ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের উদ্দীপনা, বিহারীলালের গীতিরস, সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কিশোরচিত্তকে সম্পূর্ন গ্রাস করেছিল। কিশোরকালেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার শুরু। তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা “দ্বাদশ বর্ষীয় বালক রচিত অভিলাষ” ১২৮১ সনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এতে কবির নাম প্রকাশিত হয়নি। তাঁর পরবর্তী রচনা “পৃথ্বীরাজ পরাজয়” বলে জানা যায়। তবে এ রচনাটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। হিন্দু মেলার উপহার” ১৮৭৫ সালে হিন্দু মেলায় পঠিত হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ বছর। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবি কাহিনী (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০), ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), প্রভৃতি কাব্য ও রুদ্রচন্ড (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১) প্রভৃতি গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য প্রকাশিত হয়। ‘শৈসব সঙ্গীত’ প্রকাশিত ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। এ কাব্য ও কবিতাগুলিতে ভাবী রবীন্দ্রনাথের তেমন পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিশোর কবির আবেগই এ সময়ের কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

উন্মেষ পর্ব

সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২) থেকে ‘কড়ি ও কোমল’ (১৮৮৬) মোট বার বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কাব্যের তালিকা-
(১) সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২), (২) প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩), (৩) ছবি ও গান (১৮৮৪), (৪) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), (৫) কভি ও কোমল (১৮৮৬)। এ পর্বকে রবীন্দ্র কাব্য জীবনের ‘উন্মেষ পর্ব’ নাম দিতে পারি। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ কৈশোর জীবনের অস্ফুট ভাব ও ভাষা পরিত্যাগ করে নিজস্ব ভাব ও ভাবনা, চিত্তের ও প্রকাশরীতির পরিচয় দিলেন। ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ ও ‘প্রভাত সঙ্গীত’ রবীন্দ্র কবি জীবনের প্রথম বিজয়স্তম্ভ। সন্ধ্যাসঙ্গীতের রোমান্টিক বিষন্নতা, অন্তর্মুখীনতা, দীর্ঘশ্বাস, জীবন ও জগৎকে নিজের ভঙ্গিতে উপলব্ধি - রবীন্দ্রনাথকে প্রথম মুক্তির স্বাদ এনে দিল। হৃদয়ের কান্না ছলছালয়ে উঠল - যখন রচনা করলেন - চলে গেল সকলেই চলে গেল গো।
বুক শুধু ভেঙ্গে গেল দলে গেল গো।

কিন্তু রোমান্টিক দুঃখবিলাস রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বিষাদ ও বেদনার ও হতাশার সমাপ্তি হল প্রভাতসঙ্গীতে। ‘নির্ঝারের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতায় তাই কবি আনন্দের বার্তা পাঠালেন–

‘হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।’

‘ছবিও গানে’ প্রতি দিনের জীবনের হাসি-অশ্রুর, আনন্দ-বেদনার মধ্যে কবি মর্ত্যপ্রেমকে উপলব্ধি করলেন। ‘ছনি ও গান’ চিত্র ও সঙ্গীতধর্মী। ‘কড়ি ও কোমলে’ কবির স্বাতন্ত্র্যবোধ আরও প্রখর। মর্ত্যপ্রেমের কথা আরও বলিষ্ঠভাবে কবি ঘোষণা করলেন–

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচববরে চাই।'

ঐশ্বর্য পর্ব

রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠ উপমা। কারণ রবীন্দ্রনাথের মত নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে যাওয়ার উদাহরণ দুর্লভ। তাই দেখি 'কড়ি ও কোমল' যুগ থেকে কবির উত্তরণ। মানসীতে কবির উত্তরণের প্রথম পদচিহ্ন। মানসী প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সনে। এর পরের ছ বছরে কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য কবির এ যুগকে আমরা বলতে পারি ঐশ্বর্যের যুগ। এ সময়ে যে কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তা হচ্ছে- 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), ও 'চৈতালি' (১৮৯৬)। এ পর্বের পরে 'নৈবেদ্য', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'বলাকার' মত কাব্য প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কাব্যরূপের শিল্পরূপ, মৌলিকতা, চৈতন্যের গভীরতা পূর্ববর্তী ছয় বছরের কাব্যসমূহকে অসাধারণ তাৎপর্যমন্ডিত করেছে। 'মানসী' কাব্যের গীতিময়তা 'সোনার তরী' ও 'চিত্রাতে' পরিপূর্নতা লাভ করেছে। 'সোনার তরী' কবির প্রথম জীবন সচেতন কাব্য। কবি এসময় উত্তর বাংলায় নদীতে নদীতে ঘুরে ফিরছিলেন জমিদারী তদারকিতে। পদ্মা, করতোয়া, ইছামতির কোলে কোলে যে মানুষ, তাদের যে নিভৃত জীবন যাত্রা, জনপদ, নৈসর্গিক পরিচয় কবিকে বিপুলভাবে প্রভাতি করেছিল। মানুষের জন্যই জীবন ও কাব্য। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানর সময়ই রবীন্দ্রনাথ চিনেছিলেন এ দেশের মানুষ, প্রকৃতি, সুর ও সৌন্দর্যকে। এ কাব্যে কবির অন্তর্নীবন ও বহির্জীবনের মিলনের সূচনা হয়েছে।

১৮৯৬ সালে চিত্রা কাব্য প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য। অনন্ত সৌন্দর্য প্রেমের তৃষ্ণা চিত্রা কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। এতে মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতার তত্ত্ব। প্রেমও সৌন্দর্যের অদ্বৈত সম্পর্ক, অনন্ত সৌন্দর্যের মাধুরী সংক্রান্ত কবিতাসমষ্টি সংকলিত হয়েছে। পরিপক্ক মান, শান্ত সমাহিত ভাবাবেশ, কুশলী বাকরীতি অভূতপূর্ব সৌন্দর্যচেতনা কাব্য শিল্পে পরিণত হয়েছে। চিত্রা কাব্যে জগৎ ও জীবন এক সূত্রের গাঁথা হয়ে গেছে। চিত্রা কাব্যে কবি সমগ্র চৈতন্যের মধ্যে বিচিত্ররূপিনী মানসসুন্দরীকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন- জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে" ও "অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী, তুমি অন্তরব্যাপিনী"। কবি বুঝতে পারছেন কেও যেন অলক্ষ্যে থেকে তার জীবন বিকাশের পথটি উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। তাঁকেই কবি বলেছেন জীবদেবতা। এ পর্বের শেষ কসল 'চৈতালি'। খন্ড ও অখন্ড সৌন্দর্য একসূত্রে গেঁথে তোলার ইচ্ছা - প্রাচীন ভারতবর্ষে মানসপরিক্রমা চৈতালির ভাবসম্পদ। চৈতালির মধ্য দিয়েই কবির এ পর্বের কাব্য সাধনার সমাপ্তি।

অন্তবর্তীপর্ব - পূর্ববর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল বিষয় ছিল প্রেম, সৌন্দর্য ও জীবনদেবতার ঐশ্বর্য। সীমাবদ্ধ প্রত্যয় ও অসীম চৈতন্য এ দুয়ের টানপোড়েন ছিল। চৈতালির প্রাচীন ভারত পরিক্রমা পরবর্তী কাব্যগুলিতেও সুষ্ট। অন্তবর্তী পর্বের কাব্যগুলো হচ্ছে- কথা (১৯০০), কাহিনী (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), বৈবেদ্য (১৯০৩), স্মরণ (১৯০২-৩), শিশু (১৯০৩), উৎসর্গ (১৯১৪ তে কাব্যকারে প্রকাশিত), খেয়া (১৯১০)। এ পর্বের পরিপক্ক মননের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'কল্পনা'। কল্পনা কাব্যের একদিকে আছে প্রাচীন ভারতের আত্মার অনুসন্ধান অন্যদিকে আছে প্রাণশক্তির অমেয় প্রাচুর্য। কবির মন "দূরে বহু দূরে উজ্জয়িনীপুরে" পূর্বজন্মের প্রিয়াকে অনুসন্ধান করেছে আর একই মন একই সঙ্গে মানসবিহঙ্গকে আকাশের শূন্যতার উড্ডীন রেখে চলেছে- "ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।"

গীতাঞ্জলি পর্ব

'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবে গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ 'Song offcrings` 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া অন্য কাব্যেরও কিছু কবিতা ছিল। গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৫) - তিনটি কাব্য একই সূত্রে গাঁথা। কাব্যগুলির গীতিমাধুর্য অপূর্ব। কবির অন্তর্লোকের ছবি এ কাব্যগুলিতে স্পষ্টভাবে মুদ্রিত। কবির অধ্যাত্মবোধ মানবরসে সিক্ত হয়ে কাব্যগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে।

বলাকা পর্ব

বলাকা পর্ব রবীন্দ্রজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ পর্ব। 'বলাকা' কাব্যের নামানুসারেই এ পর্বের নাম বলাকা পর্ব। এ পর্বের কাব্যগুন্থগুলি হচ্ছে- বলাকা (১৯১৬), পূরবী (১৯২৫) এবং মহুয়া (১৯২৯)। রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় জীবনের প্রসন্ন স্নিগ্ধতার মধ্যে আরেকবার ঝিলিক দিয়ে উঠল কবির জাগ্রত জীবনবোধ, বুদ্ধির দীপ্তি, বিশ্বমানবতা ও শুভবোধ। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভ্রমণ করে এসেছেন। ওখানে চলছে যুদ্ধ ও ধ্বংসের প্রক্রিয়া। কবি স্বাভাবিকভাবেই ব্যথিত। ইউরোপের দার্শনিক এর গতিবাদে কবি প্রভাবিত হয়েছেন। গতিবাদের প্রধান কথা - গতির মানেই জীবন - গতিহীনতার অর্থ মৃত্যু। দার্শনিক তত্ত্বের আড়ালে কবি এক কাব্যসত্যকে লাভ করলেন।

অন্ত্যপর্ব

১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪১ সাল এ বার বৎসরকে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার অন্ত্যপর্ব বা শেষপর্ব বলতে পারি। শেষ বয়সেও রবীন্দ্রনাথ সমান সক্রিয়। এ বার বছরে তাঁর কাব্যের সংখ্যা বার। এ কাব্যগুলিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জগৎভাবনা কোনটিরই কমতি নেই। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় 'পুনশ্চ', 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত ছন্দের বন্ধন ভাঙলেন আর বিষয়বস্তুর দিক থেকে নেমে এলেন সাধারণ জীবনের প্রাঙ্গণে। পুনশ্চের পর রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গিতে যে কাব্যগ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- শেষ সপ্তক (১৯৩৫), শ্যামলী (১৯৩৬), পত্রপুট (১৯৩৬)।

অসুস্থতার পরে রবীন্দ্রনাথের প্রান্তিক (১৯৩৮) এবং 'সেঁজুতি' (১৯৩৮) কাব্যগ্রন্থ দুটি উল্লেখযোগ্য। এ কাব্যগুলিতে মর্ত্যের জীবনের সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক তার কথাই বলেছেন। ১৯৪০-৪১ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে রোগশয্যায়, আরোগ্য ও 'জন্মদিনে' কাব্য তিনটি। দীর্ঘ দিনের সাধনার পরও রবীন্দ্রনাথের বোধের স্তর এখনও প্রসারিত হচ্ছে। মৃত্যু শিয়বের কাছে দাঁড়িয়ে। তখন কবি লিখেছেন—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বানী লাগি কান পেতে আছে।"

জন্মদিনে

২. "ওর চিরকাল
টানে দাঁও, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।'

আরোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় ছড়া (১৯৪৩) ও শেষ লেখা (১৯৪১)।

রবীন্দ্রনাথের বিশাল কবিকৃতি ক্ষুদ্র অবয়বে রেখাঙ্কন সম্ভব নয়। প্রথমজীবনের ভাবোচ্ছাস, রোমান্স, ভগবতপ্রিয়তা, ভারসয়তা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করলেও সারাজীবন ব্যাপী সাধনায় অর্জিত প্রজ্ঞাদৃষ্টি, মানব মহিমা ও জগতের ঐশ্বর্যকে মহিমামন্ডিত করেছে।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ প্রতিভায় বাংলা কাব্যকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কাব্যের স্বপ্নময় জগৎ একের পর এক জয় করার চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি সমকালের বাঙালি পাঠককে মোহমুগ্ধ, স্বপ্নাবিষ্ট করে রেখেছিল। তাই রবীন্দ্রযুগে আরও যে কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের প্রতি বাঙালি পাঠক কমই সচেতন ছিলেন। সূর্যের প্রখর আলোতে হারিয়ে যাওয়া তারার মত অন্য কবিরা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তেমন করে চোখে পড়েনি। আর রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বাণী ও ছন্দে অন্য কবিরা এত বিহ্বল ও প্রভাবিত ছিলেন যে রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে চিহ্নিত করা খুব কঠিন ছিল। ফলে সমকালীন অধিকাংশ কবিই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাব ও ভাবনা, বিষয় ও বৈচিত্র্য, ছন্দ ও উপমার ব্যর্থ অনুকরণ করেছেন।

কয়েকজন মাত্র কবি রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে নতুন সুর ও ছন্দ, কথা ও কোলাহল সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং কাজী নজরুল ইসলাম।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৮৮২-১৯২২

রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও নিজস্বতা অর্জনে যাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অন্যতম। তাঁর রোমান্টিক কবি প্রকৃতির সঙ্গে এসে মিশেছে সংযত জ্ঞান ও ক্লাসিক মন: প্রকর্ষ। ছন্দের বিচিত্র ঐশ্বর্য, বাকরীতির বিস্ময়, ইতিহাস-পুরান-প্রত্নতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও একই সঙ্গে প্রেম-প্রকৃতি, স্বাদেশিকতা তাঁর কবিতায় ধরতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতার স্বাদ বিচিত্র। প্রত্যক্ষ জীবনের বিষয় ও ঘটনাকে তিনি কবিতায় রূপ দিতে চেয়েছেন। ছন্দ ও রূপের প্রত্যক্ষ নির্মাণ সেকালের অনেক পাঠককে আকৃষ্ট করতে

পেরেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যেটি, সেটি হচ্ছে কবিতার বহিরঙ্গ নির্মাণের দক্ষ রূপকৌশলী কবিতার অন্তর্লোকের বিষয়টি তেমন প্রস্ফুটিত করতে পারেন নি। কবিতার অন্তঃপুরের স্নিগ্ধতা ও প্রসাদ প্রায়ই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকাশিত হয়নি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অপূর্নতা থাকলেও অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদগুলির সৌকর্য এমন যে তাকে রূপান্তরিত না বলে মৌলিক কবিতা বলা যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি- "অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি। আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে; ইহা শিল্পকর্ম নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য"।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রধান কাব্যগুলি হচ্ছে- বেনু ও বীণা (১৯০৬), হোমশিখা (১৯০৭) তীর্থ সলিল (অনুবাদ, ১৯০৮), তীর্থরেনু (অনুবাদ- ১৯১০), ফুলের ফসল (১৯১১) কুহু ও কেকা (১৯১২), অভ্র আবীর (১৯১৩)।

মোহিতলাল মজুমদার
(১৮৮৮-১৯৫২)

মোহিতলাল মজুমদার জীবনবাদী কবি। জীবনকে দেখার তাঁর নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। মোহিতলাল তাঁর কবিতার বিমূর্ত প্রেমের সাধনা করেননি। অধ্যাত্মবাদের ভাবরসে নয় কামনার জ্বলন্ত আগুনে দেহের সঙ্গে প্রেমকে সম্পর্কযুক্ত করে জীবনকে দেখেছেন মোহিতলাল। কবির জীবনকে দেখার এ দৃষ্টি সেকালে ছিল অভিনব।

মোহিতলাল মজুমদার সুদক্ষ শিল্পীর মত সুসংস্কৃত ও মার্জিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাব্যে আরবি, ফারসি শব্দেরও সুচারু ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মোহিতলাল দুর্ধর্ষ জীবনের চিত্র এবং ইসলামের ইতিহাসের কিছু মোহনীয় কাহিনী তাঁর কবিতায় বর্ণনা করেছেন। যেমন- 'নাদির শাহের জাগরণ', 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর', 'বেদুঈন' ইত্যাদি। মোহিতলাল মজুমদারের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে- 'স্বপন পসারী (১৯২২), বিস্মরনী (১৯২৭), স্মরগরল (১৯৩৬), হেমন্ত গোধূলি (১৯৪৬) এবং 'ছন্দ চতুর্দশী' (১৯৫১)।

কাজী নজরুল ইসলাম
(১৮৯৯-১৯৭৬)

রবীন্দ্র কাব্যবৃত্তের সম্পূর্ণ বাইরে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতার চমক সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শান্ত রসের কবি। সেদিক থেকে বলা যায় নজরুল ইসলাম ছিলেন রুদ্ররসের কবি। অত্যন্ত জোরালো ও ঝাঁঝাল কণ্ঠস্বরে নজরুল ইসলাম চমকে দিয়েছিলেন বাংলা কাব্যের অঙ্গনকে। এর পিছনে যে কারণগুলো ছিল তা হচ্ছে- নজরুল ইসলাম এসেছিলেন ইসলামের ঐতিহ্যের আশ্রয় থেকে, অল্পশিক্ষিত ও অনগ্রসর সমাজের সঙ্গে ছিল তাঁর যোগবন্ধ ও তিনি জড়িত ছিলেন দেশের রাজনৈতিক বিদ্রোহের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে সেকালের দেশকালেরও একটি হদিস নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয়দের মনে আশা জেগেছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির। সন্ত্রাসবাদের শুরু এসময়। রুশ বিপ্লবের সাফল্য এদেশবাসীর মনে আশা জাগিয়েছিল। কমরেড মুজাফফর আহমদের ভারতে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠা হয় এ সময়ে। মুজাফফর আহমদের সঙ্গে নজরুল ইসলামের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এ সময়ে খেলাফত আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তখনকার জনসাধারণকে এ সমস্ত ঘটন প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। নজরুল সেনাবাহিনী থেকে ফিরে এসে সহজেই এই উত্তপ্ত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন। সমস্ত রকম অত্যাচার - অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকণ্ঠ হয় উঠলেন। এক বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আবেগ নিয়ে নজরুল ইসলাম রচনা করলেন বিদ্রোহী কবিতা। এ কবিতা দিয়েই নজরুলের বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠা। 'বিদ্রোহী' কবিতা দিয়েই বোঝা গেল নজরুলের প্রকৃতি- তিনি তীব্র বেগবান ও অস্থির।

নজরুল ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি সাময়িকতায় বিশ্বাসী। সাময়িক ঘটনা জীবন অথবা আবেগ তাঁর কবিতার অবলম্বন। এ প্রকৃতির কারণেই তিনি একই সঙ্গে কবিতা রচনা করেছেন - প্রচারমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সংবাদপত্র পরিচালনা করেছেন। প্রেমের কবিতা যখন লিখেছেন তখনও সাময়িকতা এসেছে।

নজরুল ইসলাম অজস্র গানও রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম - অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশি (১৯২৪), সিন্ধু হিন্দোল (আ ১৯২৭), সাম্যবাদী (১৯২৫), চক্রবাক (১৯২৯), ছায়ানট (১৯২৫), দোলন চাঁপা (১৯২৩) ইত্যাদি। তাঁর গানের বই - বুলবুল (১৯২৮), জুলফিকার (১৯৩২) ও বনগীতি (১৯৩২)। কাব্যানুবাদ - রুবাইয়াত ই ওমর খৈয়াম (১৯৩০) ও রুবাইয়াত ই হাফিজ।

সমসাময়িক অন্যান্য কবি

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সমসাময়িক কালের কবি বিশিষ্টতার অনেকেই সচেতন অথবা অবচেতন মনে রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুলকে অনুসরণ করেছেন। এদের সবাই বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। কিন্তু তাঁদের কাব্য প্রচেষ্টাকে আমরা ছোট করে দেখতে পারি না। কারণ সাহিত্যের অঙ্গনকে এ কবিরাই সঞ্জিবীত করে রাখেন। সমসাময়িককালে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন এমন কয়েকজন কবির কথা নিচে আলোচিত হল।

গোলাম মোস্তফা- গোলাম মোস্তফা নজরুলের সমসাময়িক। তিনি গদ্য ও কবিতা দুটোই লিখেছেন। ইসলামি আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাঁর কাব্যের প্রেরণা ইসলাম ও প্রেম। একসময় তিনি প্রচুর স্কুল পাঠ্য বই ও শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন। হালি ও ইকবালের উর্দু কবিতার অনুবাদ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম- রক্তরাগ (১৯২৪), হাস্নাহেনা (১৯২৭), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্যকাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৯৩৬), মুসাদ্দাস-ই-হালী (১৯৪১), 'কালামে ইকবাল' (১৯৫৭), শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া (১৯৬০)।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), কবি শাহাদাৎ হোসেন কাব্যচর্চার রবীন্দ্র অনুসারী। তাঁর কবিতায় ছন্দের মাধুর্য লক্ষ্য করা যায়। ইসলামি আদর্শের অনুরাগী ছিলেন। 'রূপচ্ছন্দা' সর্বাধিক খ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে সাহিত্যের নতুন পথ রচনার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী করেছিলেন। নবীন সাহিত্যিকদের রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে সাহিত্যের নতুন পথ রচনার সামর্থ্য কিন্তু এই প্রাণশক্তি থেকেই এসেছিল। তবে একই সঙ্গে বিচলিত সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথাও মনে রাখা দরকার। ১৯৩০ সাল থেকেই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসকে নাড়া দিয়েছিল। বেকার সমস্যা, রাজনৈতিক আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবদান দুর্ভিক্ষ, অব্যবস্থা, শ্রমজীবীদের চরম সঙ্কট, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বাঙালির মানস জগতে দারুণ পরিবর্তন এনেছিল। এসব কারণেই শান্ত স্থির আদর্শের অহিংস বানী ক্রমশ জনসমাজের কাছে ফাঁকা বাক্যবিলাস বলেই মনে হচ্ছিল।

আমরা লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্রনাথের সমকালের সাহিত্যের সুর ও কণ্ঠ ক্রমেই উচগ্রামে উঠার প্রবণতা। মোহিতলাল ও নজরুল এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে ছিলেন। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন কাব্যপ্রত্যয়ের অনুসন্ধান আমরা দেখি কলিকাতার কল্লোল (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩) এবং ঢাকার প্রগতি (প্রথম প্রকাশ ১৯২৭) পত্রিকায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কালিকলম (১৯২৬)। এদের সাধনা ছিল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে পথ খোঁজা। সাহিত্যের আধুনিকতার সন্ধানী এ লেখকেরা প্রায় সবাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এঁরা অনেকেই ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে সুপন্ডিত অথবা ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

সচেতনভাবে রবীন্দ্রবিরোধীতা করলেও সবাই যে রবীন্দ্রপ্রভাবকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন - তা নয়। অজিত দত্ত এরকমই একজন কবি। তিনি জন্ম-রোমান্টিক প্রগতির পাতায়, লালিত পালিত। তাঁর কাব্যের নাম- কুসুমের মাস (১৯৩০), পাতাল কন্যা (১৯৩৮), নষ্টচাঁদ (১৯৪৫), পুনর্ভবা (১৩৪৫), 'ছায়ার আল্পনা' (১৯৫৩)। প্রধানত প্রেম, সৌন্দর্য ও আবেগময়তা তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৮) - 'প্রগতির' সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু দৃঢ়ভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভাবাদর্শের বিরোধিতা করেছিলেন। একই সঙ্গে কবিতার 'বাঙমূর্তি' ও 'ভাবমূর্তির' আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবানী' ১৯২৫ সালে প্রকাশিত। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে- বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), পৃথিবীর প্রতি (১৯৩৩), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দময়ন্তী (১৯৪৪), দ্রোপদীর শাড়ী (১৯৪৮), শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর (১৯৫৫)। রবীন্দ্র নাথের বিরুদ্ধে বহু তীক্ষ্ণ ও তির্যক মন্তব্য করলেও বুদ্ধদেব বসু রোম্যান্স, প্রেম ও সৌন্দর্য চিন্তার বাইরে তাঁর কার্যতা নিয়ে যেতে পানে নি। তবে সাহিত্য নিয়ে সতত তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র শব্দকল্প সৃস্টিতে কিছু নতুনত্ব নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর কাব্যের সমাজবোধ নজরুলের সমাজবোধের সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে মানবতার বাণী প্রশংসনীয়। তাঁর কাব্যগুলো হচ্ছে- 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৪০), ফেরারি ফৌজ (১৯৪৮), সাগর থেকে সেরা (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৬০) প্রভৃতি।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) - জীবনানন্দ দাশ এ পর্যায়ের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর প্রথম কাব্য 'ঝরা পালক'। এ কাব্যে নজরুল ও মোহিতলালের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কবির নিজস্ব কাব্যধারা সৃষ্টি হয়েছে পরের কাব্যগুলিতেই। তাঁর অন্যান্য কবিতাগ্রন্থ 'ধূসর পান্ডুলিপি' (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭)। জীবনানন্দের কাব্য চিত্ররূপময়। প্রতীক ও স্যররিয়েলিজমের সঙ্গে জীবনের ব্যাখ্যাহীন বিষন্নতা, ইতিহাসের পথে পর্বে বিচরণ, আসন্ন অগ্রহায়ণের শীতার্ত বেদনা জীবনানন্দের কবিতায় প্রায়ই রূপ-রস ও গল্পের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বিশ শতকের ব্যর্থতাও আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু কবিকে নৈরাশ্যের যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে। দেশকালের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভের জন্যই কবিকে

ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁর কবিতার জগৎ অনেক সময় অপরিচিত মনে হয়। তাঁর স্বপ্নের মর্ত্যে তাই দেখি কুহেলিকা, ছায়া ও আলোর, হেমন্তের জনস্রোত, ইঁদুর, প্যাঁচা আর বাদুড়ের। অন্যদিকে পল্লী প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ প্রলেপ দেখি মাটির গল্পে, পাতা নড়ার শব্দে, গাছের ডালের প্রগাঢ় সজীবতায়। জীবনানন্দের প্রকৃতি অসম্ভব মমতাময়ী।

আধুনিক বাংলা কাব্যে জনপ্রিয়তার মানদন্ডে জীবনানন্দ অগ্রনী। এর কারণ কবির বাকরীতিকে পাঠকের আন্তরিকভাবে গ্রহণ। আধুনিক কবিতার বাণী ও রসমূর্তির একটি আদর্শ জীবনানন্দের হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জীবনানন্দের জনপ্রিয় একটি কবিতার কয়েকটি চরণ—

'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে শখিয়াছে খুদ
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা
নির্জন মাছের চোখে; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ-মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।'

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)- সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুভাষাবিদ পন্ডিত। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাঁর প্রথম কাব্য 'তন্বী' ১৯৩০ সালে প্রকাশিত। একাব্যটি কবিমানসের দিক থেকে মৌলিক নয়। এতে রবীন্দ্রনাথের ছায়া সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সুধীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্য - অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনি (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৬), দশমী (১৯৫৬)। শব্দের পিনদ্ধ ক্লাসিক বন্ধন, শব্দের অপ্রচলিত অর্থে প্রয়োগ তাঁর কবিতাকে দুর্বোধ্য করেছে। কিন্তু এ বেড়াজাল ডিঙিয়ে কবিতার অন্ত:পুরে প্রবেশ করলে রোমান্টিক কবি প্রকৃতি ও প্রেম-সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাওয়া যায়। বুদ্ধিবাদকে সুধীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু হৃদয়াবেগকে অবরুদ্ধ রাখতে পারেননি। তাঁর কবিতায় আছে ভাস্কর্যের কঠিনতা। এসব মিলিয়ে সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার একটি নতুন দিকের সূচনা করেছেন।

বিষ্ণুদে—নিজস্ব বেদনাবোধের সঙ্গে দেশ-সমাজ, মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি ও অপমান (১৯০৯-১৯৮১), নাগরিক জীবনের ব্যর্থতা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে বিষ্ণুদের কবিতায়। বিষ্ণু দে মার্কসবাদী কবি। তব মাঝে মাঝেই রোমান্ডের জগতে ফিরে এসেছেন। তিনি কবিতার প্রচলিত রীতি ভেঙেছেন - অসঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গতি আবিষ্কার করেছেন। ফলে কবিতার এক পংক্তির সঙ্গে পরের পংক্তিরবাহ্যমিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাবের অসুষ্ঠতার সঙ্গে এসব প্রক্রিয়া যুক্ত বলে অনেক সময় বিষ্ণুদের কবিতা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। বিষ্ণু দের প্রধান কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে- উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩২), চোরাবালি (১৯৩৮), পূর্বলেখ (১৯৪০), সন্দ্বীপের চর (১৯৪৭), অন্বিষ্ট (১৯৫০), নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫০)।

জসীম উদ্‌দীন
(১৯০২-১৯৭৭)

জসীমউদ্দীন এক নতুন কাব্যচেতনার পোষকতা করে বাংলা কবিতার আসরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি গ্রামের মানুষ, তাদের জীবন, গ্রামীণ নিসর্গকে উপাদান করে কাব্য চর্চা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে শালীন ধারার যে কাব্য চর্চা ছিল - তার সঙ্গে এর বড় মিল ছিল না। জসীম উদ্‌দীনের মিল বরং লোকসাহিত্য, চন্ডীমঙ্গল ও ময়মনসিংহ গীতিকার মত সাহিত্যের সঙ্গেই। গ্রাম ও গ্রামের জীবনকে উপাদান করলেও জসীমউদ্দীন অবশ্যই গ্রাম্য কবি নন। তার কারণ কবিতার উপমা ও অলঙ্করণে, কাব্যের আঙ্গিক ও গঠন প্রকৃতি নির্ণয়ে জসীমউদ্‌দীন অনুশীলন করেছেন। 'কবর' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। এ কবিতায় মর্মান্তিক বেদনার এমন এক সুর শুনতে পেলাম যা একান্ত মানবিক। বলিষ্ঠ কোন জীবনাদর্শ নয় - মহান মানবের পতনও নয় - কিন্তু এমন একটি বেদনার ধ্বনি 'কবর' কবিতায় উচাচারিত হয়েছে যা মানবজীবনের ট্রাজেডিকেই প্রকাশ করেছে।

জসীমউদ্‌দীন পল্লী জীবনের কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলার জন্য পল্লীর সহজ অথচ সতেজ উপমা ব্যবহার করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যগ্রন্থের নাম - 'রাখালী' (১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), নক্সী কাঁথার মাঠ (১৯২৮), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩), ধানখেত (১৯৩১) ইত্যাদি। তাঁর নক্সীকাঁথার মাঠ কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের নাম "Thd field of the Embroidered Quilt".

'রাখালী' কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৯২৭। কবির 'কবর' কবিতাটি এ কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'নকসী কাঁথার মাঠ' -এ আছে পার্শ্ববর্তী গ্রামের দুই তরুণ-তরুণী, রূপা ও সাজুর মিলন-বিরহ, দুঃখ-বেদনার জীবন কাহিনী। বিরহিনী সাজুর অকাল মৃত্যুতে কাহিনীর সমাপ্তি। 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্যগৃন্থটির প্রশংসা করে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন- "... ... ...

জসীম উদ্‌দীনের নক্সীকাঁথার মাঠ” কাব্যখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ যেন সেই পুরাতন পল্লীকে ফিরিয়া পাইলাম - সেই পল্লীর পথ-ঘাট - এ যেন কত চেনা হৃদয়ের দরদ দিয়া আঁকা। পাড়াগায়ের মেয়ের দুটি ডাগর চোখ, পল্লী রাখালের চোখ জুড়ানো কালরূপ, মুসলমান লেঠেলদের মারামারি- বাংলার বিবাহ বাসর, গিন্নির ঘর-কন্না - এই সকল দৃশ্যে বুক জুড়াইয়া গেল।”

‘সোজনবাদিয়ার ঘাট’ কাব্যটি গঠন বৈপুণ্যে ও শিল্প সৌন্দর্যে “নকসী কাঁথার মাঠের’ চেয়ে শ্রেষ্ঠ। দুলী ও সোজনের প্রেমের কথা এখানে রূপায়িত হয়েছে। বালুচর, ধানখেত, রূপবতী কাব্যে নক্সী কাঁথার মাঠ অথবা সোজন বাদিয়ার ঘাটের মত শিল্প সাফল্য চোখে পড়ে না।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. কবি হিসেবে ঈশ্বরগুপ্তের মূল্যায়ন করুন।
২. আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রবর্তক হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিচয় দিন।
৩. আধুনিক বাংলা গীতি কবিতার প্রবর্তক হিসেবে বিহারীলালের অবদান কতটুকু, লিখুন।
৪. বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অবদানের পরিচয় দিন।
৫. রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিদের পরিচিতি দিন।

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বাংলা নাটকের জন্ম পাশ্চাত্য প্রভাব থেকেই। তবে প্রাচীন ভারতে নাটকের অস্তিত্ব ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য ধরনের নাটকের চর্চা শুরু এদেশে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আল্পকাল পর থেকেই। ১৭৫৩ সালে কলকাতার লালবাজারে প্রতিষ্ঠিত 'প্লে হাউস' এদেশে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয়। ১৭৯৫ সালে দেশীয় নটনটীর সাহায্যে প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হয়। অবশ্য এ বাংলা নাটকটি ছিল The disguise এর বাংলা অনুবাদ 'ছদ্মবেশী'। একজন রুশীয় যুবক হেরেসিম লেবেডেফ এ নাটকটি অনুবাদ করেন ও রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে ভারতচন্দ্রের গান ও কবিতা ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রায় একই সঙ্গে লেবেডেফের উদ্যোগে Love is the best doctor এর অনুবাদ করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এসব নাট্যাভিনয়ে বাঙালি দর্শকদেরও দেখার সুযোগ হয়েছিল। সহজেই এ সব নাট্টাভিনয়ের প্রভাব পড়তে থাকে। বাঙালিরাও ক্রমশ উৎসাহিত হয়ে উঠেন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা ও নাট্টাভিনয়ের ব্যাপারে। ধনী বাঙালিরা এ সময় তাঁদের বাসভবনেই নাট্টালয় প্রতিষ্ঠা করে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এ সময়ের বাঙালি প্রতিষ্ঠিত নাট্টালয়গুলি হচ্ছে– হিন্দু থিয়েটার, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্টশালা, পাথুরিয়া ঘাটা বঙ্গনাট্টালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা।

১৮৫৭ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের মৌলিক নাটক কুলীনকুল সর্বস্ব অভিনীত হয়। এ সময়ের আরও কিছু নাটকের নাম জানা যায়। যেমন হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' (মার্চেন্ট অব ভেনিসের অনুবাদ), যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের "কীতিবিলাস" নাটক (১৮৫২), তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জ্জুন, কালী প্রসন্ন সিংহের 'বাবু' প্রভৃতি নাটক। যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম ট্রাজেডি। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে রামনারায়ণ হিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রথাকে ব্যঙ্গ করেছেন। রামনারায়ন আরও তিনটি নাটক রচনা করেন। সেগুলো হচ্ছে- 'নবনাটক', রুক্মিনীহরণ (১৮৭১) ও কংসবধ (১৮৭৫)। এছাড়া রামানারায়ণ চারটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন। তিনি তিনটি প্রহসনও রচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দান অসামান্য। তবে নাটকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আকস্মিক। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় উপলক্ষ্যে নাটকটির একটি ইংরেজি অনুবাদ দরকার হয়। সেকালের ইংরেজরাও বাংলা নাটক দেখতে যেতেন। তাঁদের সুবিধার জন্যই ইংরেজিতে অনুবাদ করা। এ অনুবাদের দায়িত্ব পড়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর। তিনি অনুবাদ করে দিলেন ও দেখলেন কত ব্যর্থ নাটকের জন্য কি রাজকীয় আয়োজন। তখনই তাঁর বাংলা নাটক রচনার আগ্রহ জাগে।

মধুসূদনের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাহিনীতে চরিত্রগুলি ধারাবাহিকভাবে পূর্ণতা পায়নি। মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতী (১৮৬০)। গ্রীক পুরানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক। এটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডিও বলা হয়। প্রাচ্য নয়, পাশ্চাত্যরীতি ও অলঙ্কার অনুসরণ করে কৃষ্ণকুমারীকে বিয়োগান্তক করেন। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে পূর্ণ জীবনের রূপ এ নাটকে আমরা লক্ষ্য করি। মায়াকানন (১৮৭৪) একটি দুর্বল নাটক।

প্রহসন রচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), প্রহসন দুটিতে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ আছে। একদিকে যেমন নব্য আধুনিকদের ব্যঙ্গ করেছেন তেমনি বয়স্ক গ্রামীণদের ও বিদ্রুপ বাণে বিদ্ধ করেছেন।

দীনবন্ধু মিত্র
(১৮৩০-১৮৭৩)

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের পটভূমিতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকটি রচিত। সমাজ সচেতন নাটক এর পূর্বেও আমরা পেয়েছি। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রের সমাজ সচেতনতা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। ইংরেজদের শাসনের অন্ধকারের দিকের কথা দীনবন্ধু মিত্রই প্রথম নাটকে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুদিত হলে অনুবাদক জেমস লঙ রাজরোষে পতিত হয়েছিলেন।

এ নাটকের পাত্রপাত্রী সবাই টাইপ। তবে গ্রামীণ পটভূমিতে আশ্চর্য জীবন্ত। সংলাপ সৃষ্টিতে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

দীনবন্ধু আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন। নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), লীলাবতী (১৮৬৭) এবং কমলে কামিনী (১৮৭৩)। দীনবন্ধু প্রহসনও রচনা করেছিলেন। 'সধবার একাদশী' ১৮৬৬, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), জামাই বারিক (১৮৭২)। প্রহসনগুলির সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ আছে। মুধুসূদনের প্রহসন দুটির প্রভাব এগুলোতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

সমসাময়িক কালে মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২), জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর নাট্য চর্চা করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের নাটকের নাম পুরুবিক্রম (১৮৬৪), সরোজিনী (১৮৭৫) অশ্রুমতি (১৮৭৯) এবং স্বপ্নময়ী (১৮৮২)। তিনি কয়েকটি প্রহসনও রচনা করেন। সেগুলি হচ্ছে- "কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), এমন কর্ম আর করিব না (১৮৭৭), ইত্যাদি।

মীর মশাররফ হোসেন

বাংলা সাহিত্য গদ্য রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। তিনি নাটকও রচনা করেছিলেন। তাঁর বসন্তকুমারী ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। মশাররফ হোসেনের পরবর্তী নাটক "জমিদার দর্পণ"। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জমিদারদের অত্যাচার ও অনাচারের কাহিনী এতে রচিত হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেনের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মীর মশাররফ হোসেনের অন্য নাটক বেহুলা গীতাভিনয় ১৮৮৯ এ প্রকাশিত হয়। তিনি একটি প্রহসনও রচনা করেন। প্রহসনটির নাম 'এর উপায় কি'? (১৮৭৬)।

এসময়ের আরেকজন মুসলিম নাট্যকার মুহম্মদ আব্দুল করিম। প্রাপ্ত তথ্যমতে তাঁর জন্ম ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। আব্দুল করিম 'জগৎ মোহিনী' নামে একটি নাটক রচনা করেন। নাটকটি ১৮৭৫ এ প্রকাশিত হয়। আব্দুল করিমের অন্য নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ
(১৮৪৪-১৯১২)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অভিনয়ে তিনি যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমন নাট্য পরিচালনায় ও নাট্য রচনায়। সেকালে গিরিশচন্দ্র অভিনয় গুরু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জনসাধারণ যেন সহজে নাটক দেখতে পারে সেজন্য পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নাটকের প্রয়োজনে তাঁকে নাটক লিখতেও হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের নাটক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক। তাঁর রাবণ বধ (১৮৮১), সীতার বনবাস (১৮৮২), রামের বনবাস (১৮৮২) ইত্যাদি পৌরাণিক নাটক। অভিমন্যু বধ (১৮৮১) ও পান্ডবের অজ্ঞাত বাস" মহাভারতের মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটক 'বিল্বমঙ্গল'।
কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালির সমস্যা নিয়ে বেশ কটি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল 'প্রফুল্ল' নাটকটি। তাঁর অন্যান্য সামাজিক নাটক 'মায়াবসান' (১৮৯৮), বলিদান (১৯০৫), গৃহলক্ষ্মী (১৯১২) ইত্যাদি।

গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। এ পর্যায়ের তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক "সিরাজদ্দৌলা"। নাটকটি তৎকালীন শহুরে মানসিকতাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। তাঁর অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী'।

গিরিশচন্দ্র আলাদীন, আবু হোসেন প্রভৃতি সঙ্গীতমুখর নাটকও রচনা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র শেকসপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন।

রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় শিল্পে অভিজ্ঞ ছিলেন বলে গিরিশচন্দ্র নাটক রচনায় যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তেমন একই কারণ দুর্বলতার জন্যও দায়ী। মঞ্চের উপযোগী বিশেষ কাঠামোকেই তিনি বারবার অনুসরণ করেছেন। অভিনয় শিল্পীদের পারদর্শিতা দেখেই তাঁকে নাটকের চরিত্র নির্মাণ করতে হয়েছে। অনেক সময়ই জীবনকে খুব লঘু ও হাল্কাভাবে স্পর্শ করেছেন। ফলে নাটকের যে প্রত্যাশিত গভীরতা তা গড়ে উঠেনি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
(১৮৬৩-১৯১৩)

দেশাত্মবোধক ও হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্র লাল রায় বাংলা সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকারও। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটক ও বেশ কয়েকটি প্রহসন রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আগেও ঐহিসাসিক নাটক লেখা হয়েছে বটে কিন্তু তাঁর আগে

ঐতিহাসিক নাটকের বলিষ্ঠ ধারা সৃষ্টি হয়নি। পৌরাণিক নাটকের প্রবাহ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে পেরেছিলেন।

'তারাবাঈ' (১৯০৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। এ নাটকের কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে টডের 'রাজস্থান' থেকে। নাটকের ঘটনাবলীতে অসামঞ্জস্যতা ও বিক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) তুলনামূলকভাবে বলিষ্ঠ নাটক। এ নাটকে স্বদেশপ্রীতির পরিচয় আছে। 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) নাটকে ডি. এল রায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা বলেছেন। মোগল ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করে ডি. এল রায় দুটি নাটক রচনা করেছেন। এর প্রথমটি নূরজাহান (১৯০৮) ও দ্বিতীয়টি 'সাজাহান' (১৯০৯)। 'নূরজাহান' নাটকে প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে। নূরজাহান একটি সার্থক ট্রাজিডি। 'সাজাহান' সম্ভবত ডি. এল. রায়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক। সাজাহানের শেষ জীবনের কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ করে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। মানব জীবনের শোকাবহ দুর্ভোগের চিত্র তাকে জনপ্রিয় করেছিল। 'মেবার পতন' একটি নীতিমূলক ঐতিহাসিক নাটক। চন্দ্রগুপ্ত ১৯১১ সালে এবং 'সিংহল বিজয়' ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক এ দুটি নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান অপেক্ষা লৌকিক কাহিনীতে বেশি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সামাজিক নাটক দুটি 'পরপারে' (১৯১২) এবং 'বঙ্গনারী' (১৯১৬)। প্রহসন রচনায় ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম প্রহসন 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫)। অন্যান্য প্রহসন, বিরহ (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তিনটি পৌরণিক নাটক লিখেছেন। সেগুলো হচ্ছে- পাষাণী, (১৯০০) সীতা (১৯০৮) এবং ভীষ্ম (১৯১৪)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্যের অঙ্গণে নাটকেরও একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। গীতিকবিতায় ব্যক্তিমনের অনুরাগরঞ্জিত প্রকাশ থাকে। নাটক প্রধানত বস্তুশিল্প (objective art)। নাট্যকার নিজের ব্যক্তিত্বস্বাতন্ত্র্যকে গোপন করে অন্যমানুষের আবেগ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলেন। ফলে গীতিকবি যাঁরা, তাঁরা নাটক রচনায় প্রায়ই সফল হন না। রবীন্দ্রনাথের জন্যও এ কথা সত্য। রবীন্দ্রনাথের নাটকে নানা বৈচিত্র্য আছে, আদর্শ ও তত্ত্ব আছে, সে পরিমাণে নাটকের প্রতি নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নেই।

শৈশব জীবন থেকেই রবীন্দ্রনাথ নাটকের পরিমন্ডলে বড় হয়েছিলেন। নাটক, নাট্যমঞ্চ, অভিনয় ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলোর প্রভাব তাঁর নাটকে অনিবার্যভাবে পড়েছে।

কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য লিকেছেন। এগুলোতে একই সঙ্গে কাব্যধর্ম, নাট্যধর্ম ও গীতিধর্ম মিলিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রুদ্রচন্দ্র (১৮৮১), বাল্মিকী প্রতিভা (১৮৮১), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), মায়ার খেলা (১৮৮৮), বিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪), ও 'কাহিনী' (১৯০০) -এর নাম করা যায়। এগুলোতে গীতিধর্মিতা যত প্রবল নাট্যধর্মিতা তত নয়।

প্রচলিত নিয়মাযুগ নাটকও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। যেমন 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), মালিনী (১৮৯৬), মকুট (১৯০৮) প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯) এ নাটকগুলিতে নাটকের প্রচলিত রীতিকে রবীন্দ্রনাথ অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। যদিও লেখক সমালোচকদের সম্ভাব্য সমালোচনার কথা সকৌতুকে বলেছেন—

'কেহ বলে, ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লীরিকের বড় বাড়াবাড়ি।

সত্যিকার অর্থে লিরিকের প্রাধান্য সত্ত্বেও এ নাটকগুলোতে নাটকের আঙ্গিক অনেকটাই অনুসরণ করা হয়েছে। 'রাজা ও রাণী' পঞ্চাঙ্ক নাটক। বিক্রম ও সুমিত্রার দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে রচিত। তবে এ নাটকে কিছু কিছু অতিনাটকীয়তা আছে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নাটকটির কিছু সংস্কার করে গদ্যে 'তপতী' (১৯২৯) নামে নাটক রচনা করেন।

'বিসর্জন' নাটকটিও পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট। হৃদয়ানুভূতি ও মানবপ্রীতি এ নাটকের বৈশিষ্ট্য। 'মালিনী' অনেক সংহত ও বলিষ্ঠ নাটক। 'প্রায়শিস্ত' রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। উগ্র স্বাদেশিকতা যে মঙ্গলজনক নয় - এটিই রবীন্দ্রনাথের এখানে মূল বক্তব্য। নটীর পূজা (১৯২৬) বৌদ্ধযুগের কাহিনী নিয়ে রচিত।

হাস্যরসাত্মক নাটক–

রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করেন। এ পর্যায়ের 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), চিরকুমার সভা (১৯৩৬)। এ নাটকগুলিতে ভদ্র, মার্জিতরুচির হাস্য পরিহাস পাওয়া যায়।

রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক

রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকগুলিতে লেখকের নাট্যপ্রতিভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের সাঙ্কেতিকতার মতই নাটকেও সাঙ্কেতিকতা তাৎপর্যপূর্ণ। এ পর্যায়ের নাটকগুলি হচ্ছে- রাজা (১৯১০)। অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২৫), রক্তকরবী (১৯২৬), কালের যাত্রা (১৯৩২)।

'রাজা' নাটকের কাহিনী বৌদ্ধ কুশজাতক থেকে গৃহীত। কুরূপ রাজা ও সুন্দরী রাণীর জীবনের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি কিভাবে হল তার কাহিনী আছে এ জাতকে। রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রানী সুরঙ্গমার চিত্র অঙ্কন করে কাহিনীটির নাট্যিক রূপ দিয়েছেন ও তত্ত্বটির তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে পরিচিত সাঙ্কেতিক নাটক। এখানে বালক অমলের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে মানববেদনার একটি দিককে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তুলে ধরা হয়েছে। 'ফাল্গুনী'তে জীবনের একটি সত্যকে লেখক প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সে সত্যটি হচ্ছে- জরা ও যৌবন, একই সত্তার ভিন্ন রূপমাত্র। 'মুক্তধারা', রক্তকরবী, কালের যাত্রা - এ তিনটি রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা সাঙ্কেতিকতার সাহায্যে বলা হয়েছে।

শেষ যুগে রবীন্দ্রনাথ তাসের দেশ (১৯৩৩), চিত্রাঙ্গদা, (১৯৩৬), চন্ডালিকা (১৯৩৭) শ্যামা (১৯৩৯) রচনা করেন। এ নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অবদান। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের অনুকৃতি এখানেও লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে নাটক

বিভাগপূর্ব কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে মুসলিম নাট্যকারদের পদচারণা শুরু হয়। শাহাদাৎ হোসেন, আকবরউদ্দীন এবং ইব্রাহিম খান বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। ইব্রাহিম খান (১৮৯৪-১৯৭৮) -এর ঐতিহাসিক নাটক কামাল পাশা (১৯২৮) ও 'আনোয়ার পাশা'। আধুনিক তুরস্কের নবজন্মদাতা কামাল পাশা ও মুসলিম সমাজের উন্নয়নের কাহিনীই এ দুটি ঐতিহাসিক নাটকের বিষয়বস্তু।ইব্রাহিম খানের সামাজিক নাটক 'কাফেলা'। এছাড়া তিনি শিশুতোষ কিছু নাটকও রচনা করেন।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) চারটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। নাটকগুলি হচ্ছে- 'সরফরাজ খাঁ' (২য় সং ১৯৩৬), 'নবাব আলবির্দ্দী', 'মসনদের মোহ' (১৯৪৬), এবং 'আনার কলি'। নাটকগুলির পটভূমি ইতিহাস হলেও মূল বিষয় মানবিক প্রণয় ও দুর্বলতা।

আকবর উদ্দিন (১৮৯৬-১৯৭৮) ঐতিহাসিক ও সামাজিক দুধরনের নাটকই রচনা করেছেন। 'সিন্ধু বিজয়' (১৯২৮) তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। মোহাম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু বিজয়ের ঘটনা নিয়ে নাটকটি রচিত। 'নাদির শাহ' (১৯৫৩) আফগান সম্রাট নাদির শাহের দিল্লী বিজয়ের কাহিনী নিয়ে লিখিত। তবে 'সিন্ধুবিজয়ের' চেয়ে এটি দুর্বল নাটক। আকবর উদ্দিন 'আজাদ' ও মুজাহিদ (১৯৬৩) নামে আরও দুটি নাটক রচনা করেন।

নূরুল মোমেন নাট্যকার হিসাবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। নাটকের ভাব ও আঙ্গিক আধুনিক। রবীন্দ্র পরবর্তীকালের নাট্য আন্দোলনকে অনেকটাই রসবোধ ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ তাঁর নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। রূপান্তর (১৯৫৯)ও নেমেসিস (১৯৪৮) দুটি উল্লেখযোগ্য নাটক। নূরুল মোমেনের অন্যান্য নাটক আলোছায়া (১৯৬২), বহুরূপা (১৯৫৮), যদি এমন হোত (১৯৬২), নয়া খান্দান (১৯৬২)।

আসকার ইবনে শাইখ (জন্ম ১৯২৫) ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক লিখেছেন। অগ্নিগিরি (১৯৫৯), রক্তপদ্ম (১৯৬৮) ঐতিহাসিক নাটক। বিরোধ (১৯৪৮), প্রতীক্ষা (১৯৬০), অনেক তারার হাতছানি (১৯৬৫) আসকার ইবনে শাইখের সামাজিক নাটক।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) - মুনীর চৌধুরী বাংলা নাটকের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছেন। অভিনয় শৈলী, নাটকের আঙ্গিক চেতনা, গভীর সমাজবোধ, তীক্ষ্ণ সংলাপ রচনা ইত্যাদি তাঁর নাটককে সমৃদ্ধ করেছে ও বিশিষ্ঠতা দান করেছে। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬৫) তাঁর প্রথম নাটক। ইতিহাস ও কিংবদন্তীর আড়ালে কিছু মানবসত্যকে নাট্যকার এখানে প্রকাশ্য করেছেন। যুদ্ধ নিয়ে আসে ধ্বংস ও ট্রাজেডি। যুদ্ধ একদিকে যেমন বাইরের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তেমনি অন্তর্জীবনকেও দলিত-মথিত করে সর্বনাশকে ডেকে আনে। 'রক্তাক্ত প্রান্তরে' যুদ্ধবিরোধী মানসিকতাকে আমরা লক্ষ্য করি।

কবর (১৯৫৩) নাটকে তিনটি রচনা স্থান পেয়েছে। 'মানুষ', 'নষ্ট ছেলে' ও 'কবর'। 'মানুষ' নাটকে আছে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে একটি মানবীয় বোধে উত্তরণে নাটকটি শেষ হয়েছে। 'নষ্ট ছেলে' রাজনৈতিক আন্দোলনের

পরিপ্রেক্ষিতে রচিত নাটক। 'কবর' ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত। তখনকার ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনের কাহিনী নাটকটিতে আছে। 'দন্ডকারণ্য' (১৯৬৬) এ তিনটি নাটক স্থান পেয়েছে। 'দন্ড', 'দন্ডধর' এবং 'দন্ডকারণ্য'। নাটকগুলি ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপে পূর্ণ ও সংলাপের অভিনবত্বে আকর্ষনীয়।

শওকত ওসমান (১৯১৭-) প্রধানত ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হলেও তিনি কিছু নাটকও লিখেছেন। 'আমলার মামলা', 'তস্কর ও লস্কর', 'কাঁকরমণি', 'এতিমখানা' তাঁর সামাজিক নাটক। সমাজ-সংসার, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি নাটকের মূল বিষয়। নাটক রচনায় তেমন সাফল্যের পরিচয় তিনি দেননি।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন। তিনি কয়েকটি নাটকও লিখেছেন। নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর সমাজ সচেতন তা, নিরীক্ষামূলক মনোভাবের পরিচয় মেনে। বহিপীর ও তরঙ্গভঙ্গ সৈয়দ ওয়ালিউল্লার নাট্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

আলাউদ্দীন আল আজাদ (জন্ম ১৯৩২) কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর 'ইহুদির মেয়ে' একটি কাব্য নাটক। মায়াবী প্রহর (১৯৬৯) সমাজ সচেতনতামূলক নাটক। 'মরক্কোর যাদুকর' (১৯৫৯), তাঁর একটি রূপক নাটক।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) -এর 'শকুন্ত উপাখ্যান' (১৯৬৮) একটি রূপক নাটক। মানুষে-মানুষে হিংসা-দ্বন্দ্ব নয় - প্রয়োজন মৈত্রী - 'শকুন্ত উপাখ্যানে" এ বাণীটি নাট্যকার প্রকাশ করেছেন। 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৬৫) একটি ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার শেষ স্বাধীন নওয়াব সিরাজউদ্দৌলাকে পূনর্মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। 'মহাকবি আলাওল' (১৯৬৬) একটি জীবন ভিত্তিক নাটক।

আনিস চৌধুরীর (জন্ম ১৯২৯) মানচিত্র ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। মানচিত্রে স্কুল শিক্ষকের জীবনের হতাশা ও বঞ্চনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। নীলিমা ইব্রাহিমের (জন্ম ১৯২১) 'দুয়ে দুয়ে চার' (১৯৬৪), সূর্যাস্তের পর (১৯৭৩), আ.ন.ম. বজলুর রশীদ 'ঝড়ের পাখি' (১৯৫৯), 'যা হতে পারে' (১৯৬২), ইব্রাহিম খলিলের ঐতিহাসিক নাটক 'স্পেন বিজয়ী মুসা' নূরজাহান ইত্যাদি এ সময়ের নাটক। এ নাটকরে অনেকগুলোই মঞ্চসফল নয়।

মৌলিক নাটক ছাড়াও বিশ্বসাহিত্যের অনেক নন্দিত নাটকের বাংলা অনুবাদ আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অনুদিত এ নাটকগুলোর মধ্যে প্রধান - গ্রীক নাট্যকার সফোক্লেস এর ইডিপাসের বাংলা অনুবাদ 'ইডিপাস' (অনুবাদক : সৈয়দ আলী আহসান), ইবসেনের 'দি এনিমি অব দি পিউপল' -এর অনুবাদ 'শত্রু' (অনুবাদ কবীর চৌধুরী, বার্মার্ড শর 'ইউ নেভার ক্যান টেল, এর অনুবাদ কেউ কিছু বলতে পারে না (অনুবাদ মুনীর চৌধুরী), গলসওয়ার্দীর দি সিলভার বকস এর অনুবাদ 'রূপোর কৌটা' (অনুবাদ মুনীর চৌধুরী), ইবসেনের এ ডলস হাইজ এর অনুবাদ 'পুতুলের সংসার' (অনুবাদ আব্দুল হক) ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাংলা নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে ক্রটি নিবন্ধ রচনা করুন।
২. নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়ন করুন।
৩. বাংলাদেশের নাটক সম্পর্কে ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা করুন।
৪. টীকা লিখুন– গিরীশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণকুমারী নাটক, প্রহসন, নীলদর্পন।

বাংলাদেশের সাহিত্য

১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত খন্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় ও এর নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠতে থাকে। এ সময়ে বাংলাদেশে যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁদের কেউ কেউ বিভাগপূর্ব কালের ধারাকেই বহন করেছেন। নবীন যাঁরা, তাঁরা নিজের সময়, কাল ও সমস্যাকে তাঁদের লেখায় চিহ্নিত করেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন জাতীয় জীবনের একটি মহৎ ঘটনা। এ আন্দোলনের একটি বিস্ময়কর প্রভাব পড়ে আমাদের দেশে, সাহিত্যে ও শিল্পে। ১৯৭১ সনের একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এ পরিবর্তন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের নবদিগন্তকে উন্মোচন করেছে। এ কথাগুলো মনে রেখেই আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

কবিতা

দেশ বিভাগের পরে স্বাভাবিক ভাবেই এ অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হয় ঢাকা। বিভাগপূর্বকালেও ঢাকার একটি নিজস্ব ঐতিহ্য ছিল। পাকিস্তান পরবর্তীকালে এ ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন কিছু উপাদান যুক্ত হয়। নতুন রাষ্ট্র সম্পর্কিত ভাবনা ও ধর্মীয় এীতহ্য ও প্রেরণা কোন কোন কবির রচনায় প্রবলভাবে উপস্থিত হতে দেখা যায়। আবার এ বৃত্তের বাইরেও কবিতা দেশজ পটভূমিতে পথ রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে এ যুগে যাঁরা নতুন কাব্যবৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদ প্রধানতম। ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) ইসলামি পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঐতিহ্যকে সমর্থন করতেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। জড়তামুক্ত নতুন চঞ্চল জীবন এ কাব্যের অন্বিষ্ট বিষয়। ফররুখ আহমদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ সিরাজুম মুনীরা ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। রসুল ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সকলকে উপলক্ষ্য করে এ কাব্য রচিত। 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। কবির সনেটগুচ্ছ 'মুহূর্তের কবিতা' ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। কাহিনী কাব্য 'হাতেম তায়ী' ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি দোভাষী পুঁথির আদলে রচিত। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "হে বন্য স্বপ্নেরা" ও "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"।
আহসান হাবীব (১৯১৮-১৯১৩) সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫), আবুল হোসেন (জন্ম ১৯২১) সামসাময়িককালের তিনজন কবি। আহসান হাবীবের কবিতায় এক ধরনের স্নিগ্ধ আনন্দ লাভ করা যায়। আহসান হাবীবের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামের নয়। তবে তাঁর কবিতাতেও কখনও কখনও বিদ্রুপের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম- রাত্রিশেষ, ছায়াহরিণ, সারা দুপুর ও আশায় বসতি। সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় বর্তমানকে পরিহাস করার প্রবণতা দেখা যায়।

আলাউদ্দীন আল আজাদ
(১৯৩২-)

আলাউদ্দীন আল আজাদ মূলত কথাশিল্পী। তবে কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এ যুগের অন্যান্য কবিদের মত তিনিও সমাজ সচেতন। তাঁর কাব্যের নাম মানচিত্র (১৯৬১), ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২), সূর্য জ্বালার সোপান (১৯৬৫), লেলিহান পান্ডুলিপি (১৯৭৫)।

আল মাহমুদ
(১৯৩৬-)

আল মাহমুদ একজন শক্তিমান কবি। তাঁর কাব্যে গণ মানুষের জীবনধারা কাব্যের উপাদান হয়ে ধরা দিয়েছে। লোক লোকান্তর (১৩৭০), কালের কলস (১৩৭৩) সোনালী কাবিন (১৯৭৩) প্রভৃতি কাব্যে কাব্যে একজন আধুনিক মননশীল কবিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। তবে 'বখতিয়ারের ঘোড়া' (১৯৮৪) ও পরবর্তী কাব্যগুলিতে তাঁর কাব্য মানসিকতা দারুণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

(১৯৩৬-   )

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মূলত ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের কবি। শঙ্কিত আলোকে (১৯৬৮), বিপন্ন বিষাদ (১৯৬৮), 'প্রতনু প্রত্যাশা' (১৯৭৩), 'ভালোবাসার হাতে' (১৯৭৬), 'অশান্ত অশোক', 'সঙ্গী বিহঙ্গ' (১৯৮৪) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

হাসান হাফিজুর রহমান

(১৯৩২-১৯৮৩)

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় বক্তব্য শাণিত আকারে ধরা পড়েছে। কবিতার শিল্প প্রকরণ ও কবিতার আধুনিকতা সম্পর্কে কবি সচেতন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- 'বিমুখ প্রান্তর' (১৯৬৩), 'আর্তশব্দাবলী' (১৯৬৮), 'অন্তিম শরের মত' (১৯৬৮), 'যখন উদ্যত সঙীন' (১৯৭২), 'বজ্রে চেরা আঁধার আমার' (১৯৭৬), 'শোকার্ত তরবারি' (১৯৮২) ইত্যাদি।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

(১৯৩৪-   )

ছড়াকার হিসেবেই আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর পরিচিতি সমধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'সাত নরীর হার' (১৯৫৫), কখনো বা কখনো সুর (১৯৭০), কলমের চোখ (১৯৭৪), আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, সহিষ্ণু প্রতিক্ষা (১৯৮২)।

ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশের কবিতার নতুন একটি পর্যায় চিহ্নিত করা যায়। এ সময়ে বেশ কিছু শক্তিশালী কবির আবির্ভাব ঘটে। কাব্যাদর্শের দিক থেকে ত্রিশের কবিদের ঐতিহ্যকে তাঁরা তখনও বহন করছেন। তবে দেশীয় সমস্যা ও সঙ্কট বিশেষ করে প্রভাব বিস্তার করেছে। নবরাষ্ট্র পাকিস্তানের মোহভঙ্গ হয়েছে, ভাষা আন্দোলনের সজীব স্মৃতি মানসকে উজ্জীবিত রেখেছে, সাহিত্য, সংস্কৃতি শুধু নয়। বাংলাদেশের সামগ্রিক জনজীবন তখন নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে - এহেন পটভূমিতে বাংলাদেশের কবিতা চর্চায় এগিয়ে এসেছেন অনেকেই।

শামসুর রাহমান

(১৯২৯-   )

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিমান কবি। তিরিশের কবিদের মতই বুদ্ধিবৃত্তি তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন। নগরকেন্দ্রিক জীবন চেতনা তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট করেছে। সমকালীন সমস্যা ও সঙ্কট তাঁর কবিতায় প্রায়ই ছায়া ফেলেছে। "প্রথম গান ও দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৩৬৬) তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবি শামসুর রাহমানের কাব্যবৈশিষ্ট্যের চিহ্ন এ কাব্য থেকেই সনাক্ত করা যায়। জীবন যাপনের সৌন্দর্য আজ পঙ্কিলতায় আকীর্ন যন্ত্রণাবিদ্ধ কবির তাই স্বীকারোক্তি

> 'একদা যে নদী নীলিমাকে ভালবেসে চেতনায়
> নিপুণ শিল্পীর মতো গড়েছে নিবিড় দুই তীর,
> তাকে আর পাবো নাকো দৃষ্টির রেখায় দীপ্ত, প্রাণে
> হবে না মুখর ঝর্না বসন্তের বিফল সম্ভাষে।"

"রৌদ্র করোটিতে" (১৩৭০) শামসুর রাহমানের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। সাম্প্রতিক যুগের বেদনাবোধ এ কাব্যেও সুষ্ট হয়ে ধরা দেয়। কবির তৃতীয় কাব্য "বিধ্বস্ত নীলিমা" (১৩৭৩)। কবির হতাশা ও শঙ্কিত চিত্তের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়।

সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম- ১৯২২) বেশ কয়েকটি কাব্যের রচয়িতা। পাকিস্তান পরবর্তী নতুন কাব্যবৃত্ত গঠনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। তবে আধুনিক কবিতার গঠন প্রকৃতি প্রতীক ও রূপকল্প তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নাম- 'অনেক আকাশ' (১৯৬৭), 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' (১৯৬৩), সহসা সচকিত (১৯৬৬), উচ্চারণ (১৯৬৮), আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৪), সমুদ্রেই যাব (১৯৮৫), চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা।

তালিম হোসেন (জন্ম ১৯১৮) মুসলিম ঐতিহ্য সচেতন করি। তাঁর কাব্যের নাম- 'দিশারী' ও 'শাহীন'। সানাউল হকের (জন্ম ১৯২৩) কাব্যের নাম 'নদী ও মানুষের কবিতা', 'সম্ভাব্য অনন্যা', সূর্য অন্যতর। ইসলামি ভাবাদর্শের কবি সৈয়দ আলী আশরাফের কাব্যের

নাম- 'চৈত্র যখন'। আবদুল গণি হাজারী জীবনের নানা অসঙ্গতি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম- 'সামান্য ধন', 'সূর্যের সিঁড়ে', ও 'জাগ্রত প্রদীপে'। আশরাফ সিদ্দিকীর (জন্ম ১৯২৬) 'তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

এ কালে বাংলা কবিতার সাধনায় অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। সংক্ষেপে আমরা উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্যগ্রন্থের নাম করতে পারি। সৈয়দ শামসুল হকের একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৬৯), মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'জুলেখার মন' (১৯৫৯), জিয়া হায়দারের 'এক তারাতে কান্না' (১৩৭০), আবু হেনা মোস্তফা কামালের 'আপন যৌবন বৈরী' (১৯৭৪), শহীদ কাদরীর 'উত্তরাধিকার' (১৯৬৯), আব্দুল মান্নান সৈয়দের জ্যোৎস্না রোদ্রের চিকিৎসা (১৯৬১), জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৭), রফিক আজাদের 'অসম্ভবের পায়ে' (১৯৭৩), চুনিয়া আমার অর্কডিয়া (১৯৭৭), সশস্ত্র সুন্দর (১৯৮২), নির্মলেন্দু গুণের 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' (১৯৭০), 'না প্রেমিক না বিপ্লবী' (১৯৭২), আসাদ চৌধুরীর 'তবক দেওয়া পান' (১৯৭৫), 'বিত্ত নাই বেসাত নাই' ১৯৭৬, মোহাম্মদ রফিকের বৈশাখী পূর্ণিমা (১৯৭০), কীর্তিনাশা (১৯৭৯) এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

উপন্যাস

সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা উপন্যাস। সাম্প্রতিককালে লেখকদের বেশি পদচারণা এক্ষেত্রে। স্বাভাবিকভাবেই বহু লেখকের বিচিত্র মনোভাব নাই বাংলাদেশের উপন্যাস ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। বাংলাদেশের উপন্যাসের পরিচিতি মোটামুটিভাবে কয়েকটি ধারায় চিহ্নিত করা যায়। সে ধারাগুলো হচ্ছে–

ক) গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস
খ) নগর জীবনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস
গ) আঞ্চলিক জীবন প্রধান উপন্যাস
ঘ) দর্শন ও মনস্তত্ত্ব প্রধান উপন্যাস
ঙ) ইতিহাস-চেতনা সমৃদ্ধ উপন্যাস
চ) বিবিধ

রশীদ করিম

(জন্ম-১৯২৫)

প্রধানত নগরচেতনাকে অবলম্বন করে রশীদ করিমের উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উত্তম পুরুষ' ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস 'প্রসন্ন প্রহর' (১৯৬৩), আমার যত গ্লানি' (১৯৭৩) ও প্রেম একটি লাল গোলাপ (১৯৭৮)।

আবু ইসহাক

(জন্ম- ১৯২৬-২০০৩)

আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। একজন দুঃস্থ মাতার জীবন কাহিনী, গ্রামের মোড়ল শ্রেণীর মানুষের অত্যাচার ও নির্মমতা, বহুবিবাহ, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ইত্যাদির সজীব চিত্র আছে 'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে। উপন্যাসের মর্মান্তিক পরিণতি পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

লেখকের দুটি গল্পগ্রন্থ আছে। একটির নাম মহাপতঙ্গ (১৯৬৩) অন্যটি হারেম (১৯৬২)।

আলাউদ্দীন আল আজাদ

(জন্ম- ১৯৩২)

আলাউদ্দীন আল আজাদের উপন্যাসে সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও লক্ষ্য করা যায়। আজাদ তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে কখনও গ্রাম এবং কখনও শহরকে ব্যবহার করেছেন। 'কর্নফুলী' (১৯৬২) উপন্যাসটিতে মূলত চট্টগ্রামের মাঝি জীবনের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস- 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪), 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (১৯৬০), 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' (১৯৬২)। আলাউদ্দীন আল আজাদ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছোটগল্পও রচনা করেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর নাম- অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮), 'নয়নচারা' (১৯৪৪) সৈয়দ ওয়ালিউল্লার প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্পের বই। তাঁর আরেকটি গল্পগ্রন্থের নাম দুইতীর (১৯৬৭)। বহিপীর (১৯৬০) ও তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪) নামে দুটি নাটকও তিনি লিখেছেন।

শহীদুল্লাহ কায়সার

(১৯২৫-১৯৭১)

শহীদুল্লাহ কায়সার পেশায় সাংবাদিক। বিভাগোত্তরকালে তিনি দুটি উপন্যাস রচনা করেন। প্রথমটি 'সংশপ্তক' ১৯৬৫ সনে প্রকাশিত। তৎকালীন যুগচেতনাকে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপনার চেষ্টা করেছেন লেখক। একটি বৃহৎ পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসটির কাহিনী গ্রাম ও শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৪৭ এর পূর্বের বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, ঘুণে ধরা, পতনোম্মুখ অভিজাত সামন্ত

সমাজ, গ্রামজীবনের কুসংস্কার ও সঙ্কীর্নতা, পাকিস্তান পরবর্তী নতুন ভুঁইফোড় শ্রেণীর আবির্ভাব। ঢাকা ও কলকাতার নানান কাহিনী এ উপন্যাসে ঠাঁই পেয়েছে।

শহীদুল্লাহ কায়সারের দ্বিতীয় বই 'সারেংবউ' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। একটি আঞ্চলিক জীবন কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। নাবিক জীবনের দুঃসাহসিকতা এবং গ্রামীণ জীবনে নির্যাতিতা নায়িকা 'নবীতুনের' জীবনকাহিনী চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। সমুদ্র উপকূলের যে মানুষেরা সমুদ্রের কল্যাণে বেঁচে থাকে, জীবন সংগ্রামে অবতীর্ন হয় তাদের কাহিনী সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে কমই। সেদিক থেকে 'সারেং বউ' বাংলা সাহিত্যে একটি চমকপ্রদ উপন্যাস।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লা

(১৯২২-১৯৭১)

সৈয়দ ওয়ালিউল্লা বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। প্রথম জীবনে সাংবাদিকতা ও পরে বিদেশে কূটনীতিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লাল সালু' বিভাগোত্তর কালে (১৯৪৮) সালে প্রকাশিত হয়। গ্রামীণ পটভূমিতে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ভন্ডামির এক জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ উপন্যাসে। তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' , (১৯৬৪) ও কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) পরীক্ষামূলক দুটো উপন্যাস। এ দুটি উপন্যাসই লেখকের বিদেশে থাকাকালীন সময়ে রচিত। বিদেশে অবস্থানকালেও লেখকের মানস চৈতন্যের মূল যে দেশের মাটিতে প্রোথিত এ দুটো উপন্যাসে তা পরিচয় পাওয়া যায়। মানব জীবনের নানান জটিলতা, তার দার্শনিক বিশ্লেষণ, উপস্থাপনার কৌশল সবকিছু মিলিয়ে 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' বাংলা সাহিত্যে দুটি উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

পাকিস্তানী শাসকদের তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। 'সমাগম' উপন্যাসে একটি ভিন্ন ধরনের বক্তব্য স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ অনেক সময়ই শওকত ওসমানের উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয়বস্ত হয়েছে। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর নাম- পিজরা পোল (১৯৫১), জুনু আপা ও অন্যান্য (১৯৫১), প্রস্তর ফলক (১৯৬৪), সাবেক কাহিনী (১৯৫৩)।

কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ

(১৯২১-১৯৭৫)

কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে গ্রামীণ জীবনকে প্রধান উপজীব্য করেছেন। তাঁর 'চর ভাঙা চর' (১৯৫১) চর অঞ্চলের কৃষকদের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস "নীড় ভাঙা ঝড়" নোনা পানির ঢেউ (১৯৫০), বাতাসী (১৯৫৮), সুরের আগুন (১৯৬০)।

গ্রামীণ জীবনকে অবলম্বন করে আরও অনেকেই উপন্যাস লিখেছেন। ইসহাক চাখারী লিখেছেন তিনটি উপন্যাস- পরাজয় (১৯৬১), মায়ের কলঙ্ক (১৯৬২), ও মেঘবরণ কেশ (১৯৬৩)। আব্দুর রাজ্জাক তাঁর কন্যাকুমারী উপন্যাসে গ্রামের গ্রাম-সমাজের অবক্ষয়কে চিত্রায়িত করেছেন। সাঁওতালদের জীবন কাহিনী নিয়ে তাসাদ্দুক হোসেন উপন্যাস লিখেছেন 'মহুয়ার দেশে' (১৯৫৮)। তাঁর অন্য দুটি উপন্যাস পৃথিবীর রং

'খেলারাম খেলে যা' (১৯৭৩)। প্রেম, ভালবাসা, যৌনতা, বিকার ও নানা ধরনের মানবিক দুর্বলতা লেখক এ উপন্যাসগুলোতে সাবলীল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কয়েকটি গল্পগ্রন্থের নাম- আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), তাস (১৯৫৪), রক্তগোলাপ (১৯৬৪), শীত বিকেল (১৯৫৯)।

'উজান তরঙ্গ' (১৯৬২), 'জেগে আছি' (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৪), যখন সৈকত (১৯৬৭), আমার রক্ত স্বপ্ন আমার (১৯৭৫)।

জহির রায়হান

(১৯৩৩-১৯৭২)

জহির রায়হান মূলত একজন চলচ্চিত্রকার। চলচ্চিত্রের কাহিনী, সংলাপ ও শিল্পশৈলীর অভিজ্ঞতা তাঁর কথাসাহিত্যকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর উপন্যাসে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলো হচ্ছে- 'আর কত দিন'

(১৯৭০), 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮), 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯), 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০), 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪)। জহির রায়হানের গল্পগ্রন্থের নাম- 'সূর্যগ্রহণ' (১৯৫৫)।

আব্দুল গাফফার চৌধুরী

(জন্ম- ১৯৩৪)

ছোটগল্প ও উপন্যাস দুধরনের রচনাতেই আব্দুল গাফফার চৌধুরী সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থ হচ্ছে- কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫৯), সম্রাটের ছবি (১৯৫৯), সুন্দর হে সুন্দর (১৯৬০)। 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের কাহিনী। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস- 'নাম না জানা ভোর' (১৯৬২), নীলযমুনা (১৯৬৪), শেষ রজনীর চাঁদ (১৯৬৭)।

সৈয়দ শামসুল হক

(জন্ম- ১৯৩৫)

সৈয়দ শামসুল হক কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক সবই লিখেছেন। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র পরীক্ষার-নিরীক্ষার পরিচয় পাই। নরনারীর জীবনের নানা সমস্যা, বিকৃতি ও মনস্তত্ত্ব তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। তাঁর উপন্যাস- দেয়ালের দেশ (১৯৫৯), এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪),

চ) বিবিধ– শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি', 'সমাগম', চৌধুরী শামসুর রহমানের "শেষ পর্বে শ্রীকান্ত", সত্যের সেনের "রুদ্ধ দ্বার মুক্তপ্রাণ", আব্দুল গাফফার চৌধুরীর "শেষ রজনীর চাঁদ" ইত্যাদি।

আবু জাফর শাসসুদ্দীন

(১৯১১-১৯৮৮)

বিভগপূর্ব কালেই ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার হিসেবে আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব। কর্মজীবনে তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। মাসিক মোহাম্মদীতে প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। মধ্যবিত্ত নগরজীবনের কাহিনী লিখেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও লিখেছেন। তাঁর পরিত্যক্ত স্বামী (১৯৪৬) এবং 'মুক্তি' (১৯৪৭) উভয় উপন্যাসেই মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের কথা আছে। 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৩), এবং 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৭৪) - দুটো উপন্যাসই ইতিহাসের বিশাল পটভূমিকায় রচিত। আবু জাফর শামসুদ্দীনের গল্পগ্রন্থগুলোর নাম- জীবন (১৯৪৮), এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য (১৯৬৭), শেষ রাত্রির তারা (১৯৬৬) এবং রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা (১৯৭৮)।

শওকত ওসমান

(১৯১৭-   )

শওকত ওসমান বিচিত্রতার সাধক। একই সঙ্গে তিনি বিবিধ প্রকার উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ইত্যাদি লিখেছেন। উপন্যাসে সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনী গ্রামীণ বিস্তৃত পটভূমিতে রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস "জননী" (১৯৬৮)। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস 'বনি আদম', 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২, 'সমাগম' (১৯৬৭), দুই সৈনিক (১৯৭৪), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), 'জাহান্নাম হতে বিদায়' (১৯৭১) ইত্যাদি। শওকত ওসমানের কোন কোন উপন্যাস যেমন 'ক্রীতদাসের হাসিতে' তৎকালীন গ্রাম ও নগরকেন্দ্রিক যৌথ জীবনের চিত্রও কোন কোন উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হচ্ছে- আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা', শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক', সরদার জয়েনউদ্দীনের 'অনেক সূর্যের আশা', ইসহাক চাখারীরর "মেঘ বরণ কেশ", আবুল মনসুর আহমদের 'জীবন ক্ষুধা', আবুল ফজলের "রাঙ্গা প্রভাত", আব্দুর রাজ্জাকের 'কন্যাকুমারী' ইত্যাদি।

গ) আঞ্চলিক জীবন প্রধান উপন্যাস– আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী', তাসাদ্দুক হোসেনের 'মহুয়ার দেশে', শহীদুল্লাহ কায়সারের "সারেং বৌ" শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কণ্যা', কাঞ্চনমালা, সরদার জয়েন উদ্দীনের 'পান্নামতি' ইত্যাদি।

ঘ) দর্শন ও মনস্তত্ত্ব প্রধান উপন্যাস– মানুষের দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারার প্রতিনিয়ত বিকাশ হচ্ছে এবং এর প্রভাব পড়ছে সাহিত্য ও শিল্পে। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দর্শন, মনস্তত্ত্ব, মনোবিকলন ও যৌনবিকৃতির নানা প্রভাব পড়ছে। আলাউদ্দীন আল আজাদের

'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', "শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন", রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস', সৈয়দ শামসুল হকের 'দেয়ালের দেশ' 'এক মহিলার ছবি', 'অনুমপ দিন', সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা', শহীদ আখন্দের 'পান্না হল সবুজ' শওকত আলীর 'পিঙ্গল আকাশ' ইত্যাদি।

ঙ) ইতিহাস- চেতনা সমৃদ্ধ উপন্যাস– সমকালীন জীবনের মত অতীত ইতিহাসের বিষয় ও সমাজ মানুষকে আকৃষ্ট করে। উপন্যাসের বৃহৎ পটভূমিতে ইতিহাস অনেক সময় মূর্ত হয়ে উঠে। বাংলাদেশের সাহিত্যে এ ধারার প্রতিনিধি হচ্ছে- শামসুদ্দীন আবুল কালামের "আলমনগরের উপকথা', সরদার জয়েনউদ্দীনের "নীল রঙ রক্ত", আবু জাফর শামসুদ্দীনের "ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান", মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ' সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' ইত্যাদি।

গ) গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস– গ্রাম এখনও আমাদের দেশের অর্থনীতির প্রাণ। তাই স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম জীবনের একটি জীবন্ত প্রভাব আছে আমাদের সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে। গ্রাম জীবনকে অবলম্বন করে রচিত প্রধান উপন্যাসগুলো হচ্ছে- সৈয়দ ওয়ালিউল্লার 'লালসালু', 'কাঁদো নদী কাঁদো', আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী', সরদার জয়েন উদ্দীনের 'আদিগন্ত', জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান', শওকত ওসমানের 'জননী' ইত্যাদি।

ঘ) নগর জীবনের পর্যভূমিতে রচিত উপন্যাস– আবুল ফজলের 'জীবন পথের যাত্রী', রশিদ করিমের 'উত্তমপুরুষ', 'প্রসন্ন পাষাণ', আবু রুশদের 'সামনে নতুন দিন', আতহার আহমদের "সূর্যের নীচে", পিপাসা', দিলারা হাশিমের 'ঘর মন জানালা', হুমায়ন কাদিরের 'নির্জন মেঘ', আমজাদ হোসেনের 'অসামাজিক কাহিনী', নীলিমা ইব্রাহিমের 'বিশ শতকের মেয়ে', আহসান হাবিবের 'আরণ্য নীলিমা' মিজানুর রহমান শেলীর 'পাতালে শর্বরী' ইত্যাদি।

প্রবন্ধ

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত প্রবন্ধ সাহিত্য ও সমৃদ্ধ হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিস্তার ও শিক্ষা-দীক্ষা, পঠন-পাঠনের প্রসার প্রবন্ধ সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি এনেছে। প্রবন্ধের বই-পুস্তক যেমন- তেমন সংবাদপত্র সাময়িক পত্রিকার প্রচার ও প্রসার প্রবন্ধ সাহিত্য উন্নয়নে সহায়তা করেছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(১৮৮৫-১৯৬৯)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে' এম. এ পাশ করেন। পরে প্যারিসের 'সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল কাহ্নপাদ ও সরহপাদের দোহাকোষের মূলপাঠ নির্ণয় এবং অপভ্রংশ ভাষার পরিচিতি নির্ধারণ। ভাষাতত্ত্বের গবেষক হিসেবে কর্মজীবনের সূত্রপাত হলেও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহিত্য, ভাষা ও ইতিহাসের নানা অঙ্গনে গবেষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভাষাবিজ্ঞানে বর্তমানে অনেক আধুনিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্রমবিকাশে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর 'লে শাঁ মিস্তিক' এবং বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'লে সঁ দ্যু বঙ্গালি' ১৯২৮ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সালে তিনি "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" নামে একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি "বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত" রচনা করেন। "বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" দুখন্ডে প্রকাশিত, এতে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। 'Budhist Mystic songs' নামে বৌদ্ধ গান ও দোহার ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। "পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান" (১৯৬৪) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদনা করেন। আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যের অর্ধাংশ সম্পাদনা করেন। এর ভূমিকায় 'জায়সির' 'পদুমাতে' কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের কাব্যের অনুবাদ যথাক্রমে "দিওয়াই-ই-হাফিজ' ও রুবাইয়াত ই 'ওমর খয়্যাম' প্রকাশ করেন। তবে দুটি অনুবাদই অত্যন্ত দুর্বল। দুটি গ্রন্থেরই ভূমিকায় গ্রন্থকার মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনেকে মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এইগুলো এখনও পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়নি।

মুহম্মদ আব্দুল হাই
(১৯১৯-১৯৬৭)

মুহম্মদ আব্দুল হাই বিশেষ করে ধ্বনি তত্ত্বে গবেষণা করেছেন। ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থগুলি হচ্ছে- A phonetic and phonelogical study of Nasals and Nasalization in Bengali (1960), The sound structure of English and Bangali (with W.J.Ball) 1961 ও "ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব" (১৯৬৪)। মুহম্মদ আব্দুল হাই -এর সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে- 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (১৯৫৪), 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৬০), 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' (১৯৬৯)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা মূলক পত্রিকা "সাহিত্য পত্রিকা" দশ বছর সম্পাদনা করেন। গবেষণা সংগঠক হিসাবে আব্দুল হাই -এর কৃতিত্ব অসাধারণ।

সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসান প্রধানত কবি হলেও গবেষণা কর্মে তিনি অবদান রেখেছেন। তাঁর 'পদ্মাবতী' (১৯৬৮) গ্রন্থটি মূল পদুমাবতীর সঙ্গে আলাওলের পদ্মাবতীর তুলনামূলক আলোচনা। ১৯৭৩ সালে 'মধুমালতী' সম্পাদনা করেন। সৈয়দ আলী আহসানের অন্যান্য গ্রন্থের নাম, নজরুল ইসলাম (১৯৫৩), বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৫৬) ইত্যাদি।

আনিসুজ্জামান
(জন্ম-১৯৩৭)

আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৪) একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্ম। ১৯৬৮ সালে আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর 'মুনীর চৌধুরী' নামের গ্রন্থ ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

(জন্ম- ১৯৩৯)

প্রধান পরিচিতি কবি হলেও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর গবেষণায় শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৫৯ সালে তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত। তাঁর গবেষণাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে–

"আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক" (১৯৭০), 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৫), বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৭০), আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র (১৯৬২)।

মুনীর চৌধুরী

(১৯২৫-১৯৭১)

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী গবেষণার ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর 'মীর মানস' ১৯৬৫ সনে প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্য শিল্পী মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সম্পর্কে এ পুস্তকে আলোচনা করেছেন। মুনীর চৌধুরীর 'তুলনামূলক সমালোচনা' ও 'বাংলা গদ্যরীতি' যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সনে প্রকাশিত হয়।

আহমদ শরীফ

(১৯২১-১৯৯৯)

আহমদ শরীফ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। তিনি মধ্যযুগের অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ফলে অনেক অপরিচিত কবিই পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে- "সত্য কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ' (১৯৫৯), মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' (১৯৬০), শাহ বারিদ খানের গ্রন্থাবলী (১৯৬৬), দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লাবলী মজনু' (১৯৬৮), চন্দ্রাবতী (১৯৬৭), 'সৈয়দ সুলতান ঃ তাঁর গ্রন্থাবলী ও যুগ' ইত্যাদি।

আধুনিক জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কেও আহমদ শরীফ অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

Jjl °Mu¡-jl l¦h¡Cu¡a x L¡S£ eSl¦m Cpm¡j

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত

কাজী নজরুল ইসলাম

পাঠ- ১

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ফারসী কবি ওমর খৈয়ামের জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ওমরের বিভিন্ন প্রতিভার পরিচয় ব্যক্ত করতে পারবেন।
- ওমরের রুবাই রচনার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কবি পরিচিতি

ওমর খৈয়াম একাদশ শতকের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে পারস্যের খোরাশান প্রদেশের অন্তর্গত মিশাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। আধুনিককালের গবেষকদের মতে, ১০৪৫ থেকে ১০৫০ সময়ের মধ্যে ওমর জন্মেছিলেন। ওমরের পূর্ননাম ছিল গিয়াসউদ্দীন আবুল ফাতাহ্ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল খৈয়াম। খৈয়াম শব্দের অর্থ তাবুকার। এটি বংশগত উপাধি। কিন্তু পরিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মনে হয় তিনি নিজে কখনও তাবুর ব্যবসা করেননি। ওমরের মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি-পারিবার সম্পর্কে কোনো খবর জানা যায়নি।

কৈশোরে তিনি জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইমাম মোয়াফ্ রোকুদ্দীনের কাছে শিক্ষালাভ করেন। ওমর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বহু বিষয়ে সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং কবি।

কৈশোরের দুজন সহপাঠী ছিল ওমরের। হাসান তুসী এবং হাসান সাব্বাহ। তিনবন্ধু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, পরবর্তী জীবনে তাঁদের মধ্যে কোনো একজন প্রতিষ্ঠিত হলে অপর দুজনকে সাহায্য করবে। কর্মী জীবনে হাসানতুসী খোরাশানের প্রধানমন্ত্রীর পদলাভ করেন এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে হাসান সাব্বাহকে রাজদরবারে একটি উচ্চপদ দেয়া হয়। যদিও কিছুদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে পদচ্যুত ও বিতাড়িত হয়। যে সময় ওমর বিদ্যা ও কাব্য চর্চায় নিমোজ্জিত ছিলেন। পরে বন্ধু-প্রধানমন্ত্রীর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তাঁকে সাহায্য করতে চাইলে তিনি রাজ দরবারে কোনো উচ্চপদ নয়, বরং নিভৃতে বসে কাব্য - আরাধনায় দিন যাপন করতে চাইলেন। প্রধানমন্ত্রী হাসান তুসী - তাঁকে সরকারী ভাতার ব্যবস্থা করে দেন।

কিন্তু ওমর চাইলেও সব সময় নিভৃতে বসে নিরবচ্ছিন্ন কাব্য চর্চায় নিয়োজিত হবার অবকাশ পাননি। অনেক সময় বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব ও বহন করতে হয়েছে। তাছাড়া কাব্য চর্চার চেয়ে বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি তাঁর অধিকতর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

সেলজুকী সুলতানের প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণাগার পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। তিনি সাতজন পন্ডিতসহ জালালী সনের সংস্কার সাধন এবং “বীচু মালিক শাহী’ নামক জ্যোতিষী পঞ্জিকা সংশোধন করেন।

ওমর মূলত ও প্রধানত একজন বিজ্ঞানী। জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া ও অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ভূগোল ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গণিত, বীজগণিত, ও জ্যামিতি অঙ্কশাস্ত্রের এই তিনটি শাখাতেই তিনি সমপারদর্শী। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলো মূলত আরবীতে রচিত। তিনি শুধু একজন বৈজ্ঞানিক নন, দার্শনিকও বটে। দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ তিনি আরবী ও ফারসী এই দুই ভাষায় রচনা করেন। এছাড়া তিনি আবু সিনার দার্শনিক গ্রন্থ ও ফারসীতে অনুবাদ করেন।

তিনি গ্রীকদের বিজ্ঞান ও দর্শনেও সুপন্ডিত ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে আল কুফতি ‘দার্শনিকদের ইতিহাস’ এ ওমরকে গ্রীক পান্ডিত্য ও দর্শনে বিশেষজ্ঞ বলে অভিহিত করেন। ঐ শতকেই আল শাহ্‌রাজুরীর আত্মার পুর্নজন্মে উল্লেখিত হয়েছে তিনি আবু সিনার অনুসারী এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আবু সিনার কিতাব আল সিকা বা আরোন্য তত্ত্ব পাঠ করেছেন।

ওমরের রুবাই বলে প্রচলিত প্রায় একহাজার রুবাই আছে। প্রকাশভঙ্গি বা স্টাইলের দিক দিয়ে সবগুলো রুবাই একই মানের নয়। বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ওমরের জীবনের অতি সামান্য একটা অংশ জুড়ে আছে এই রুবাইয়াৎ। অনেকে মনে করেন, ভাবুক ও চিন্তাবিদ ওমর অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যেই রুবাইগুলো রচনা করেছেন। যেমন, রাজনীতিবিদ চার্চিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্কেচ রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তবে রুবাইগুলোর মধ্যে ওমরের জীবন সম্পর্কে সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

ক্ষণবাদে বিশ্বাসী ওমর এ জগতের সকল কিছু অনিত্য এরা মৃত্যুর পর কি আছে তা অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করেন। তাঁর কাব্যে শারাব-সাকির ছড়াছড়ি থাকলে ও তিনি জীবনে ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংযমী। তাঁর কাবিতায় যেমন- ভাবের প্রগাঢ়তা অথচ সংযমের আঁটসাঁট বাঁধুনী তাঁর জীবন ও ছিল তেমনি। ওমরের রুবাইয়াতের মতবাদের জন্যে তাঁর দেশের তৎকালীন ধর্মগোঁড়াদের অত্যন্ত আক্রোশ ছিল, তবু তাঁকে দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে সম্রাট থেকে জনসাধারণ পর্যন্ত ভক্তির চোখে দেখত।

ওমর আরবী ভাষাতত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাসে সুপন্ডিত এবং সে আমলের পন্ডিতদের মতো চিকিৎসা শাস্ত্রে ও পারঙ্গম ছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি ওমরকে বলা যেতে পারে এক বৈশ্বিক মানব ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ভাষায় তাকে বলা যায় Luomo Universale. এদিক দিয়ে ওমরের সঙ্গে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ তুলনীয়।

ফারসী সাহিত্যের মধ্যযুগের কবি ওমর খৈয়াম নিজ জন্মভূমি নিশাপুরেই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন। মৃত্যুর পর এখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। মৃত্যু কাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও ১১২৩ সালেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন বলে অধিকাংশের ধারণা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. উমর খৈয়াম কোন্ সময়ে কোন ভাষার কবি?
২. ওমরের পূর্ণনাম কি? খৈয়াম শব্দের অর্থ কি?
৩. ওমর কবিতা ছাড়া কোন্ কোন্ বিষয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করেন?
৪. জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ওমরের ভাবনা কি?
৫. অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে ওমর কোন্ রচনাগুলো লিখেন?
৬. ওমরের কৈশোরে যে দুজন সহপাঠী ছিলো তাদের নাম লিখুন।

নমুনাউত্তর

প্রশ্ন ঃ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ওমরের ভাবনা কি?

ক্ষণবাদে বিশ্বাসী ওমর উপলব্ধি করেছেন, এই জগতে মানুষের আসা-যাওয়া নিতান্ত অর্থহীন। কোন এক অন্ধকার লোক নেকে মানুষ এ জগতে আর্বিভূত হয়, তারপর স্বল্পকালের জন্যে খেলা খেলে আবার মহাকালের কোলে বিপীন হয়ে যায়। কাজেই এ দুনিয়ায় কোনো কিচুর মূল্য নেই, কোন কিছুর অর্থ নেই। সুতরাং এই অর্থহীন দুনিয়ায় - যে দুনিয়ায় মানুষ এক রাত্রির মুসাফির মাত্র - ওমর আনন্দে বিভোর হতে চেয়েছেন। এই দুনিয়ায় সরাইখানায় এক রাত্রির মুসাফিরের পক্ষে সুরাপান করে সাকীর সঙ্গে বিলাস নীলায় মত্ত হয়ে সময়টুকু কাটানোই সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। এ কথায় বলা যায় - 'এই ক্ষনকালীন জীবনে নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক। এই জীবন ভাবনাই ওমরের রুবাইর মূলবানী।

পাঠ- ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়ামের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন অনুবাদকদের সঙ্গে নজরুল ইসলামের অনুবাদের পার্থক্য নিরুপন করতে পারবেন।
- রুবাই কি? তার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- রুবাইয়াতের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন তিনি। নানারকম ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে থেকেও শৈশবেই নজরুলের কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৪ সালে নজরুল বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। সৈনিক জীবনেও নজরুলের লেখালেখি বন্ধ থাকেনি এবং এ সময়ই তিনি ভালোভাবে ফার্সিভাষা শিখতে শুরু করেন।

ছেলেবেলায় ধর্মীয় প্রয়োজনে দোয়া-দরুদ মুখস্থ করেছেন। কোরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কোরানের শেষ অনুচ্ছেদ আমপারা, বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করেন।

নজরুল ইসলাম রোমান্টিক কবি, বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যেরকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নালেকে নিয়ে যেত ঠিক তেমনি ইরান তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তাব রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যাননি। কিন্তু ইরানের গুল বুলবুল শিরাজি সাকী তার চারপাশে এমনই এক অজানা ভুবন সৃষ্টি করেছিল যে, সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ - করতে পারতেন। গুনীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি, একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি ফ্রান্স। নজরুলের বেলা বাঙলা ও ইরান। কীটস ও বায়বনের বেলা যেরকম ইংল্যান্ড ও গ্রীস্ম।

আরব ভূমির সঙ্গে নজরুলের যেটুকু পরিচয় সেটুকু প্রধানত, ইরানের মাধ্যমে। কোরান শরীফের "হারানো ইউসুফের যে করুন কাহিনী বহু মুসলিম-অমুসলিমের চোখের জল টেনে এনেছে; তিনি কবিরূপে - তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মাধ্যমে।

দুঃখ করোনা হারানো য়ুসুফ
কাননে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুন:
হয়ে গুলিস্তা হাসিবে ধীরে।

এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বাঙালী কবি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদ করেছেন। এরমধ্যে কান্তি ঘোষ, নজরুল ইসলাম, নরেনদেব এবং পরবর্তীকালের সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদে মূলের আঙ্গিক কতটা অক্ষুন্ন রয়েছে - তা বিচার্য বিষয়। রুবাই চতুষ্পদী শ্লোক - যার ১ম ২য় ও ৪র্থ পদের শেষে অনুপ্রাস বা মিল থাকে। কান্তি ঘোষ রুবাই -এর মিল পদ্ধতি অনুসরন করেননি। তিনি মিল দিয়েছেন কক-খখ যা রুবাই -এর নিয়ম নয়। তাঁর অনুবাদ ছন্দের দোলায় সহজে পাঠাকদের চিত্তহরণ করে।

নরেন দেবের অনুবাদ একেবারে স্বচ্ছন্দ, এত স্বচ্ছন্দ যে, এর থেকে ফরসী রুবাইর আঙ্গিক সম্পর্কে কোন ধারনাই পাওয়া যায় না। তিনি যে অনুবাদ করেছেন, তাকে বলা যেতে পারে ভাবানুবাদ। অনেক সময় ওমর তাঁর জন্যে শুধু একটা উপলক্ষ মাত্র হয়ে উঠেছেন।

সিকান্দার আবু জাফর রুবাই-এর মিল পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন বটে, কিন্তু কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একটি রুবাই ভেঙে দুটি করেছেন। অনুবাদে এধরনের স্বাধীনতা আছে কিনা তা বিচার্য।

নজরুল ইসলাম তাঁর রুবাই-এর অনুবাদ সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন- "আমি রুবাইয়াৎ বলে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দুশ রুবাই বেছে নিয়েছি" এবং ফার্সি ভাষার রুবাইয়াৎ থেকে। কারণ, আমার বিবেচনায় এইগুলি ছাড়া বাকি রুবাই ওমরের প্রকাশভঙ্গি বা স্টাইলের সঙ্গে একেবারে মিশ খায় না। আমি আমার ওস্তাদি দেখাবার জন্যে ওমর খৈয়ামের ভাব ভাষা বা স্টাইলকে বিকৃত করিনি-অবশ্য আমার সাধ্যমত। ওমরের রুবাইয়াতের সবচেয়ে বড় জিনিস এর প্রকাশ ভঙ্গি বা ঢং। কত বৎসর ধরে কত বিভিন্ন সময়ে তিনি এই কবিতাগুলি লিখেছেন, অথচ এর স্টাইল সম্বন্ধে কখনো এতটুকু চেতনা হারাননি। মনে হয় একদিনে বসে লেখা। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ওমরের সেই ঙটির মর্যাদা রাখতে, তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে যতোটা পারি কায়দায় আনতে। কতদূর সকল হয়েছি তা কাসি নবিশরাই বলবেন। ওমর খৈয়ামের ভাবে অনুপ্রাণিত ফিটজেরাল্ডের কবিতার যাঁরা অনুবাদ করেছেন, তাঁরা সকলেই আমার চেয়ে শক্তি শালী ও বড় কবি। কাজেই তাঁদের মতো মিষ্টি শোনাবে না হয়ত আমার অনুবাদ। যদি না শোনায় সে আমার শক্তির অভাব সাধনার অভাব। আমার অক্ষমতার দরুন কেউ কেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওমরের উপর চটে না যান।

রুবাই জাতীয় চতুষ্পদীতে প্রায়শ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে—তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরানী আলকারিকান বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষের মিলে বেশি ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোকে সমাপ্তি তাঁর পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতা পায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে নজরুল ইসলাম আগাগোড়া কক -খক মিলে ওমরের অনুবাদ করেছেন। শান্ত ঘোষ করেছেন বাঙলা রীতিতে অর্থাৎ কক - খখ।

মূলের অনুসরন করে নজরুল ইসলাম রুবাইএর যে সার্থক অনুবাদ করেছেন, তার ফলেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রুবাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত উত্তর। প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. নজরুল ইসলাম কখন ফারসী ভাষা শিখতে শুরু করেন।
২. কোরানের শেষ অনুচ্ছেদ আমপারা বাংলা ছন্দ কে অনুবাদ করেন?
৩. গুনীরা প্রত্যেক মানুষের দুটি মাতৃভূমির কথা বলেছেন - কেন?
৪. “হারানো ইউসুফ” -এর রচয়িতা কে?
৫. রুবাইয়াতের উল্লেখযোগ্য চারজন অনুবাদকের পরিচয় দিন।
৬. নজরুলের রুবাই অনুবাদের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

নমুনাউত্তর

প্রশ্ন ঃ নজরুলের রুবাই অনুবাদের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

নজরুল ইসলাম রুবাই অনুবাদ করেছেন মূল ফারসী থেকে। ওমরের ভাবভাগে স্টাইলকে অবিকৃত রেখেছেণ। ওমরের রুবাইয়াতের সবচেয়ে বড় জিনিশ তার প্রকাশ ভঙ্গি বা ঢং। নজরুল যথাসাধ্য তা অক্ষুন্ন রেখে অনুবাদ করেছেন।

রুবাই জাতীয় চতুষ্পদীতে প্রায়শ, প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে। তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরানী আলঙ্কারিকদের পদ্ধতি অনুসরন করে তৃতীয় ছত্রে মিল না দিয়ে চতুর্থ ছত্রের শেষে মিল দিয়ে বক্তব্যে পারিপূর্ণ, গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতা এনেছেন। নজরুল আগাগোড়া কক - খক মিল দিয়ে রুবাইয়াতে অনুবাদ করেছেন। ফলে তাঁর অনুবাদ মূলানুগ ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

পাঠ- ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- বাংলাসাহিত্যে রুরাইয়াতের জনপ্রিয়তার কারণ লিখতে পারবেন।
- রুরাইয়াতের অনুবাদকদের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

বাংলাসাহিত্যে রুবাইয়াতের জনপ্রিয়তা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনুবাদের ইতিহাস। বলা যায়, অনুবাদের মাধ্যমেই মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে অধিক। বিশ্বসাহিত্যের বিনিময় বাজারে যেহেতু অনুবাদই একমাত্র গ্রহনযোগ্য মুদ্রা - সেহেতু আরবী ফারসী, ইংরেজী সংস্কৃত - বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ ব্যাপকভাবে অনুদিত হয়েছে বাংলাভাষায়।

দীর্ঘকাল - প্রায় পাঁচশ বছরের বেশি সময় ফারসী বাংলাদেশের রাজভাষা ছিল। স্বভাবত, ফারসী কবিগণ - বিশেষত ফেরদৌসী, সাদী, রুমী, হাফিজ, খৈয়াম, জামী প্রমুখ বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত নাম। এককালে রুমী বাঙালির ঘরে ঘরে পঠিত হতো। সাদীর গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ। উনিশ শতকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সাদীও হাফিজের ভাবানুবাদ করেন সদ্ভাবশতকে। জামীর লায়লী - মজনু, ইউসুফ জোলায়খা ইত্যাদি কাহিনী কাব্য রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে মধ্যযুগে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে প্রায় উনবিংশ শতকের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ফারসী ভাষার কবি-সাহিত্যিকগণ যখন বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন - কখন বাংলা সাহিত্যে ওমরের নামটুকু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওমরকে আমরা আবিষ্কার করেছি ফারসীর মাধ্যমে নয়, ইংরেজীর মাধ্যমে। ফিটজেরান্ডের অনুবাদের মাধ্যমে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে হঠাৎ করেই ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন খৈয়াম। জীবনের প্রতি ওমরের সুনিবিড় আকাঙ্ক্ষা এবং অপারিমেয় জীবনতৃষ্ণাই তাঁকে ইউরোপে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষার ফলেই আমরা জীবনের প্রতি এক অস্তিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছি। ফলে আমাদের দৃষ্টি ওমরের প্রতি আপতিত হয়েছে। ওমরের প্রবল জীবন রস-রসিকতায় বাঙালি তাঁর নিজস্ব প্রাণ পেয়েছে। বাঙালি কবি ও পাঠকদের ওমর মুগ্ধ ও আবিষ্ট করেছেন। জীবনবাদী কবি ওমর বাঙালির মনে অকুণ্ঠ আবেদন সৃষ্টি করেছেন।

এ পর্যন্ত বেশ কজন বাঙালি কবি তাঁকে অনুবাদ করেছেন - কান্তি ঘোষ, নজরুল, নরেশ দেব, এবং সিকান্দার আবু জাফর। সত্যেণ দত্ত ও অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। এমন সৌভাগ্য অন্য কোন দেশের, কোন্ কবির ভাগ্যে রড় একটা জোটোনি।

এর কারণ-ওমরের জীবনবাদ - জীবনকে উপভোগ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা - তাঁকে বাঙালী কবি ও পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস ওমর চিরস্মরণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত উত্তর গ্রন্থগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই - সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. যে পাঠটি পড়লেন তা নিজের ভাষায় লিখুন।
২. ফারসী ভাষা কত বছর বাংলাদেশের রাজভাষা ছিল?
৩. রুবাইয়াতের অনুবাদ করেছেন ক'জন কবি? তাঁদের নাম কি?
৪. ওমর ছাড়া ফারসী ভাষার আর কোন্ কবির কাব্য বাংলায় অনুদিত হয়েছে?
৫. বাংলা সাহিত্যে রুবাইয়াত জনপ্রিয় কেন?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যে রুবাইয়াত জনপ্রিয় কেন?

মধ্যযুগে প্রায় পাঁচশ বছর ফারসীভাষা বাংলা দেশে রাজভাষা ছিল। ফলে ফারসী সাহিত্য বাংলায় অনুদিত হয়ে বাঙালি কবি-সাহিত্যিক ও পাঠকদের কাছে তাঁরা সুপরচিত ছিলেন।

ইতোমধ্যে উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমরা জীবনের প্রতি এক আস্তিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছি। ফলে বাঙালির দৃষ্টি ও ওমরের প্রতি আপতিত হয়েছে। ওমরের প্রবল জীবন রস-রসিকতায় বাঙালি তার নিজস্ব প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠার প্রতিফলন খুঁজে পেয়েছে।

ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের মাধ্যমে উনিশ শতকের মধ্যভাগে হঠাৎ করেই ওমর ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন যে কারণে - সেই একই কারনে - ওমরের জীবনবাদ - জীবনকে উপভোগ করার তীব্র আকাঙ্খা - তাঁকে বাঙালি কবিও পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

পাঠ- ৪

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ফারসী ভাষায় রুবাই বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- বিষয় অনুসারে ওমরের কাব্য কয়ভাগে বিভক্ত এবং কি কি? -তা বলতে পারবেন।
- ওমর সুরা ও সাকী বলতে কি বুঝিয়েছেন - আপনার নিজের ভাষায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ওমরের রুবাইগুলোর মধ্যে জীবন সম্পর্কে যে সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় - তা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

কাব্য-পরিচিতি

মধ্যযুগের ফারসীভাষার অন্যতম কবি ওমর খৈয়াম এক অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, রসায়ণবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং কবি। পন্ডিত কবি ওমরকে তাঁর রুবাইয়াৎ এনে দিয়েছে বিশ্বখ্যাতি। তাঁর কাব্য তাঁর দর্শন আজ সারা বিশ্বের আলোচিত বিষয়ে পরিনত হয়েছে।

ফারসী ভাষায় রুবাই বলতে বোঝায় একজাতীয় চতুষ্পদী কবিতা - যা ইংরেজী ক্ষুদ্র কবিতা এপিগ্রামের মতো, যার মধ্যে ব্যপ্ত রয়েছে এক গড়ীর ভাবের ব্যাঞ্জনা, মানব হৃদয়ের নিবিড় আনন্দ বেদনার নির্যাস, বিষাদ ভালোবাসা ও বিশ্বাস সংশয়ের প্রকাশ। রুবাই শব্দটি একবচন। এর বহুবচন রুবাইয়াৎ। চীনা চতুষ্পদী কবিতা বা জাপানী হাইকু'র সঙ্গে তুলনীয় এ রুবাই গুলো। রুবাইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরনে থাকে অন্ত্যমিল। শুধুমাত্র তৃতীয় চরনটি থাকে সম্পূর্ন স্বাধীন এবং সমগ্র ভাবটি ঘনীভূত করাই যেন এ চরনের দায়িত্ব।

বিষয় অনুসারে ওমরের কাব্য ছয়ভাগে বিভক্ত-

১. শিকায়াত-ই-রোজগার অর্থাৎ গ্রহেক্ষেরে বা অদৃষ্টের প্রতি অনুযোগ।
২. ইজ ও অর্থাৎ ভন্ডদের, বকধার্মিকদের প্রতি শ্লেষ বিদ্রূপ ও তথাকথিত আলেম বা জ্ঞানীদের দাম্ভিকতা ও মূর্খদের প্রতি ঘৃণা প্রকাস।
৩. 'ফিরাকিয়া' ও 'ওসালিয়া' বা প্রিয়ার বিরহ মিলনে রচিত কবিতা।
৪. বাহরিয়া - বসন্ত, ফুল বাগান, ফল পাখি, ইত্যাদির প্রশংসার রচিত কবিতা।
৫. 'কুফারিয়া' -ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কবিতাসমূহ। এ কবিতাগুলো ওমরের শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসেবে সমাজে আদৃত। স্বর্গ ও নরকের অলীক কল্পনা, বাহ্যিক উপাসনার অসারতা, পাপ-পুণ্যের মিথ্যা ভয় ও লাভ ইত্যাদি নিয়ে রচিত কবিতা এর অন্তর্গত।
৬. 'মোনাজাত' বা খোদার কাছে প্রার্থনা। এ প্রার্থনা অবশ্য সাধারণের মত প্রার্থনা নয়, সুফীর প্রার্থনার মত এ হাস্য জড়িত।

ওমরকে ইপিকিউয়ান বলা হয় তার 'কফুরিয়া' শ্রেণীর কবিতার জন্য। এছাড়া ওমর যা, তা ওমর ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই তুলনা হয়না।

ওমরের কাব্যে শারাব সাকির ছড়াছড়ি থাকলেও তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংযমী। তাঁর কবিতায় ভাবের প্রগাড়তার সঙ্গে সংযমের অটুট বন্ধন যেমন, তাঁর জীবনও ছিল তেমনি। এই রুবাই গুলোর মধ্যে ওমরের জীবন সম্পর্কে সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গী পরুস্ফুট হয়ে উঠেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওমরকে জীবনের মূলগত সমস্যাই পীড়িত করেছে এবং তিনি জীবরেন একটা অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন। অন্ধকার এক লোক থেকে মানুষের অকস্মাৎ এই পৃথিবীতে আর্বিভাব, মহাকালের তুলনায় অতি স্বল্পক্ষণের জন্যে এই পৃথিবীর খেলা খেলে মানুষ আবার কোন এক মহাশূণ্যলোকে যাত্রা করে। আমরা কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, আবার কোথায় চলে যাব - মানবজীবনের চির পুরাতন ও চির নতুন রহস্য ওমর উন্মোচিত ও উদঘাটিত করার করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

"কোথায় ছিলাম, কেনই আসা - এই কথাটা জানতে চাই
জন্মকালে ইচ্ছাটা মোর কেউ তো তেমন শুধায় নাই।
যাত্রা পুনঃ কোন্ লোকেতে? প্রশ্নটা তোর মাথায় থাক-
ভাগ্যদেবীর খণ্ডর পরিহাস পেয়ালা ভরে ভোলাই যাক্।"

ওমর উপলব্ধি করেছেন, এই জগতে মানুষের আসা-যাওয়া নিতান্ত অর্থহীন। কোন এক অন্ধকার লোক থেকে মানুষ-এ জগতে আর্বিভূত হয়, তার পর স্বল্পকালের জন্যে খেলা খেলে আবার মহাকালের কোলে বিলীন হয়ে যায়।
মানুষের শক্তির দম্ভ ও ঐশ্বর্য কিছুই চিরস্থায়ী নয়,-

"এই সে প্রমোদ ভবন যেথায় জলসা ছিল বাহ্‌রামের,
হরিন যেথায় বিহার করে, আরাম করে ঘুমায় শের।
মৃত্যু শিকারীর হাতে সে শিকার হল হায় আখের'।"

অর্থাৎ প্রতাপশালী সম্রাট বাহরামের জলসাঘরে হরিণ বিহার করে, বাঘ আরাম করে ঘুমায়। আর যে সম্রাট বাহ্‌রাম শিকারে এমন নৈপুণ্যর পরিচয় দিয়েছেন, তিনিও নিপুণ শিকারী হয়ে মৃত্যুর হাতে শিকার হয়েছেন। পরাক্রমশালী সম্রাট আজ মাটির তলায় শায়িত।

প্রকৃতি ও আশ্চর্য ছলনাময়ী, প্রকৃতি মানুষের সঙ্গেও প্রতারনা করে থাকে। যে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মাধুর্যে মানুষ মুগ্ধ ও মোহিত। সেই প্রকৃতি কি নিষ্ঠুর। শাহানশা'র রক্তের উপর ফুটে উঠেছে গোলাপ গালে তিল ছিল, যে সুন্দরীর, তার উপর ফুটে উঠেছে নার্গিস।

'দেখতে পাবে যেথায তুমি গোলাপ লালা ফুলের ভিড়,
জেনো, সেথায় ঝরেছিল কোনো শাহানশা'র রুধির।
নার্গিস আর গুল-বনোসা'র দেখবে যেথায় সুনীল দল,
ঘুমিয়ে আছে সেথায়-গালে তিল ছিল যে সুন্দরীর।'

সুতরাং প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-গান-শব্দ-বর্ণ-স্পর্শে আমাদের অভিভূত ও আবেগ বিহবল হওয়ার কোন হেতু নেই।

মানুষের যত জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-তত্ত্ব সব মিথ্যে।

আসল সত্য এই যে, মানুষকে একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং মাটির তলে চিরনিদ্রায় শায়িত হতে হবে।

'নিদায় নিয়ে আগে যারা গেছে চলে হে সাকী,
চির ঘুমে ঘুমায় তারা মাটির তলে, হে সাকী!
শরাব আনো, আসল সত্য আমার কাছে যাও শুনে,
তাদের যত তথ্য তোল হাওয়া গলে, হে সাকী।'

এই পৃথিবী হলো মুসাফিরের জন্যে এক রাত্রির পান্থশালা। 'মুসাফিরের এক রাত্রির পান্থ বাস এ পৃথ্বিতল।

'অজ্ঞানেরই তিমির-তলের মানুষ ওরে বে-খবর!
শূন্য তোরা, বুনিয়াদ তোর গাঁথা শূন্য হাওয়ার পর।
ঘুরিস অতল অগাধ খাদে, শূন্য মায়ার শূন্যতায়।
পশ্চাতে তোর অতল শূন্য াগ্রে শূন্য অসীম চর।'

এই জগতের সকল কিছু অনিত্য এবং মৃত্যুর পর কি আছে তা কবির অজ্ঞাত। তাই তিনি ক্ষণবাদী দর্শনে উপনীত হয়েছেনঃ

'সব ক্ষনিকের আসল ফাঁকি - সত্য মিথ্যা কিছুই নয়'-

কবি আরও উপলব্ধি করেছেন যে, মানুষ অদৃষ্টের হাতে ক্রীড়ানক মাত্রইনয়তি তাড়িত মানুষ যেন নিয়তিরূপ দাবাখেলার ঘুঁটি-

আমরা দাবা খেলার ঘুঁটি, নাইরে এতে সাদ নাই। আসমানী সেই রাজ দাবাড়ে চালায় যেমন চলচি তাই। এই জীবনের দাবার ছকে সামনে পিছে ছুটছি সব, খেলার শেষে তুলে মোদের রাখবে মৃত্যুবাক্সে ভাই!

মানুষ যদি নিয়তির হাতে ক্রীড়ানক হয় এবং মৃত্যুর পর যদি মানুষের কোন অস্তিত্ব না থাকে, পার্থিব জবিন ও যদি হয় অর্থহীন - তাহলে কবি ওমরের পক্ষে কোন মূল্যবোধে উদাসীন এবং কল্পিত স্বর্গ নরকে তাঁর কোন আস্থা নেই। এই জীবনেরই মানুষের দুঃখ ও দাহ তাঁর কাছে নরক বলে এবং সুখ ও শান্তি স্বর্গ বলে প্রতিভাত হয়েছে-

'বুকের কুন্ডে দুখের দাহ - তারেই আমি নরক কই,
মুহূর্তের যে মনের শান্তি - আমি বলি স্বর্গ নয়।'

মোহমুক্ত ওমরের দৃষ্টিতে সমাজপতি ও শহরের মুফতি, নীতিবাগীশ ও মোল্লা-মৌলভী, পীর দরবেশ ও সুফীসাধক জ্ঞানী-পন্ডিত ও দার্শনিক সবাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

এই দুনিয়ার কোনো কিছুরই মূল্য নেই। সুতরাং এই অর্থহীন দুনিয়ায় - যে দুনিয়ায় মানুষ এক রাত্রির মুসাফির মাত্র - ওমর আনন্দে বিভোর হতে চেয়েছেন। এই দুনিয়ায় সরাই খানায় এক রাত্রির মুসাফিরের পক্ষে সুরাপান করে সাকীর সঙ্গে বিলাসলীলায় মত্ত হয়ে সময়টুকু কাটানোই সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। তাই ওমর তাঁর রুবাইয়াতে বার বার সরাইখানা ও সাকীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

সংক্ষেপে ওমরের বানী হলো- এই ক্ষনকালীন জীবনে নগদ যা হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক।

সর্বনাশা মৃত্যু মুখ ব্যাদান এর আছে, আমরা দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। সেই চরম বিনাশ ও বিলয়ের আগে যতোটা সম্ভব জীবনকে ভোগ করে নেয়াই শ্রেয়-

'এক লহমা সময় আছে সর্বনাশের মধ্যে তোর
ভোগ-সায়রে ডুব দিয়ে কর একটা নিমেষ নেশায় ভোর।
আয়ুর তারা পড়ছে খসে মরণ-উষার চরণ পরে-
যাত্রা যে কাল করতে হবে - ফুরিয়ে নেশা ত্বড়িৎ কর।

এই নিখিল নাস্তির মধ্যে ওমর মানুষের কাছে মিথ্যে সান্ত্বনা বা আশ্বাসের বাণী বহন করে আনেননি। জগৎ ও জীবনকে অসার জেনে ও তিনি একে আনন্দ স্বরূপে বাড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই তিনি প্রকৃতির পাটভূমিতে সুরা ও সাকী নিয়ে মশগুল হতে চেয়েছেন। সুখবাদী ওমর বলেছেন-

'সেই নিরালা পাতায-ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌনবঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তবে মঞ্জু সুর-
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।'

এজন্যেই ওমরের জীবন-দর্শনকে ক্ষণবাদী দর্শন বলা হয়ে থাকে।

ওমরের রুবাইয়াতের সবচেয়ে বড় জিনিস- তাঁর বাগশৈলী বা প্রকাশ ভঙ্গির ঢং। কেউ কেউ বলেছেন, ওমর আগাগোড়া যেন মাতালের 'পোজ' নিয়ে তাঁর রুবাইয়াৎ লিখে গেছেন - মাতালের মতোই ভাষা, ভাবভঙ্গি শ্লেষ, রসিকতা, হাসি-কান্না সব। কত বৎসর ধরে কত বিভিন্ন সময়ে তিনি এই কবিতাগুলি লিখেছেন অথচ এর স্টাইল সম্বন্ধে কখনো এতটুকু চেতনা হারাননি। মনে হয় এক দিনের বসে লেখা।"

বলা যায় এ কবিতাসমূহে ওমরের ভাবভাষা, প্রকাশভঙ্গির ঋজুতা, অলঙ্কার ছন্দ সব কিছুতেই শিল্প নৈপুন্যের পরিচয় মেলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্বাব্য উত্তর চিন্তা করুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই যেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. ফারসী ভাষায রুবাই বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করুন।

২. সরাই কত প্রকার ও কি কি?

৩. সুরা ও সাকী বলতে কি বোঝায় - আলোচনা করুন।
৪. শিকায়াত-ই-রোজগার কি?
৫. ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ রুবাই সমূহের নাম কি?

নমুনা

প্রশ্নঃ ফারসী ভাষায় রুবাই বলতে কি বোঝায়- তা ব্যাখ্যা করুন।

ফারসী ভাষায় রুবাই বলতে বোঝায় এক জাতীয় চুতষ্পদী কাবিতা - যা ইংরেজী ক্ষুদ্র কবিতা এপিগ্রামের মতো, যার মধ্যে ব্যাপ্ত রয়েছে এক সভার ভাবের ব্যাঞ্জনা, মানব হৃদয়ের নিবিড় আনন্দ বেদনার নির্যাস, বিষাদ ভালোবাসা ও বিশ্বাস সংশয়ের প্রকাশ।

পাঠ- ৬

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ♦ আপনি রুবাইয়াতের মূলভাব জানতে পারবেন।
- ♦ সুরা ও সাকীর রূপক অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ওমরের রুবাইয়াত ও তাঁর জীবনদর্শন

ওমর খৈয়াম মধ্যযুগের ফারসী কবি। একাদশ-দ্বাদশ শতকের পারস্য দেশের সঙ্গে বিংশ শতকের বাংলাদেশের সুদূর ব্যবধান। অথচ তিনি আধুনিক কালের বাঙালি কবি ও পাঠকদের এমনভাবে আকৃষ্ট করেছেন যা অপর কোনো বিদেশী কবি পারেননি।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ওমর ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং কবি। তিনি যখন লেখনী ধারণ করেন, ফারসী সাহিত্যে তখন মধ্যযুগ। কিন্তু চিন্তা-চেতনায় জ্ঞানানুশীলনে তিনি ছিলেন আধুনিক। এই সৃষ্টি চরাচর জীবন-জিজ্ঞাসা কবিকে নানা প্রশ্নে আন্দোলিত করেছে- 'আমি কে'? কোথায় ছিলাম? কেনই বা এখানে এসেছি আবার কোথায়ই বা চলে যাব ইত্যাকার হাজারো জটিল জিজ্ঞাসার জবাব খুজতে প্রয়াসী হয়েছেন ওমর খৈয়াম। আর তাই অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে রচিত ওমরের বিশ্বখ্যাত কাব্য রুবাইয়াতে ফুটে উঠেছে এক গভীর জীবন দর্শন।

ওমর অনুধাবন করেছেন, "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন, যৌবন, ধনমান"। তাই জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার বাসনাই তিনি তাঁর চতুষ্পদী কবিতা বা রুবাইয়াতে প্রকাশ করেছেন। রুবাইগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে সুরা এবং সাকী। ইরানে কবির শারাবকে সত্যিকার মদ বলে ধরে নেন না। তাঁরা সারাব বলতে আনন্দ ভূমানন্দকে বোঝেন- যে আনন্দ রূপিনী সুরার নেশায় তাপস - ঋষি সংসারের সব ভুলে গিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকেন। সাকি বলতে বোঝেন মুর্শিদকে, গুরুকে, যিনি সেই আনন্দ শরাব পরিবেশন করেন। তার পরও কবির কাছে সময় ভয়ানক অবিশ্বাসী। জীবনবাদী কবি জীবনের একটি দিনকেও ও নিরানন্দ, বৃথা যেতে দিতে চান না। কবি বলেন—

'আজকে তোমার গোলাপ বাগে ফুটল যখন রঙ্গীন ফুল
রেখোনা পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ কজ্জুল।
পান করে নে, অমর ভীষন অবিশ্বাসী শত্রু ঘোর হয়তো এমন ফুল মাখানো দিন পারিনা আজের তুল।'
(অনু-নজরুল)

বস্তুত কবি উপলিব্ধি করেছেন, 'এজীবন অর্থহীন'। শুধু যাওয়া, শুধু আসা, শুধু স্রোতে ভাসা।' কোন্ অন্ধকার এক রহস্যলোক থেকে এর আবির্ভাব। আর কোন্ অসীমালোকে এর যাত্রা। মধ্যেখানে দুদিনের পান্থশালা। কবি এ পান্থশালায় আসবার জন্যে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তবু যখন দৈবক্রমে তাঁকে এখানে আসতে হয়েছে। এ আনন্দময় ধরণী থেকে তাঁর যাবার ইচ্ছা মোটেও নেই। তাই তার উচ্চরণ—

স্রষ্ঠা যদি মত নিতো মোর আসতামনা প্রনান্তেও এই ধরাতে এসে আবার যাবার ইচ্ছা নেই মোটেও সংক্ষেপে কই, চিরতরে নাশ
করতাম সমূলে যাওয়া আসা, জন্ম আমার সে-ও শূন্য, শূন্য এও।
(অনু- নজরুল)

অতএব কবি দৃষ্টিতে জীবন এক অসীম শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়- "Full of sound and fury. signifying nothing" এবং যেহেতু কবি উপলব্ধি করেন, মহাবিশ্বে ঘূর্ণায়মান চক্রে মানুষ অদৃষ্টের হাতের পুতুল মাত্র - তাই কবি তাঁর রুবাইগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগের কথা বলেছেন - 'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক ... ...।' বস্তুত অতীত সে তো গত, ভবিষ্যৎ ও অনিশ্চিত। তাই যে মুহূর্ত হাতের মুঠোয় এলো, তাকে আনন্দ সুধায় ভরিয়ে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

'আজ আছে তোর হাতের কাছে আগামী কাল হাতের বার।
কালের কথা হিসেব করে বাড়াসনে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গক্ষরা ক্ষনিক জীবন - করিসনে আর অপব্যয়,
বিশ্বাস কি - নিঃশ্বাসভর জীবন যে কাল পাবি ধার।'
(অনু- নজরুল)

কবি মানুষের পাপ-পুণ্যে বিশ্বাসী নন। কোনো স্বর্গ-নরকের প্রতিও তাঁর আস্থা নেই। মানুষকে তিনি বিধাতার হাতের দাবার গুটি বলে মনে করেন। তিনি অনুভব করেছেন, সমগ্র সৃষ্টি পেছান এক মহাশক্তিধরের প্রবল উপস্থিতি-

'আমরা দাবা খেলার গুটি, নাইওর এতে মন্দ নাই,
আসমানী সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।'

মতাপরাক্রমশালী সেই রাজ-দাবাড়ের পরিচালনায় জীবনে যা ঘটবোর তাতো ঘটবেই। অদৃষ্টের লিখন খন্ডাবে কে? তাই ওমরও বিশ্বাস করেন, আমরা যন্ত্রীর হাতের যন্ত্রমাত্র। তবে আধুনিক ক্ষণবাদী কবির মতো ওমরও বিশ্বাস করেন, মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর। এই একই বোধের ভিন্ন প্রকাশ দেখি এভাবে—

'তুই-ই মানুষ তুই-ই পশু, দেবতা-দানব স্বর্গদূত,
যখন হতে চাইবিরে যা হতে পারিস তুই তা যে।'

কাজেই মানুষের সরিযান রূপের প্রশ্রয়ে ওমর যে স্বর্গ রচনা করেন, সেখানে এক অনাবিল শান্তি। প্রকৃতির উদার সান্নিঘ্যে। প্রশান্তিময় নির্জনতায় সুরা ও সাকীকে নিয়ে তিনি এক অপরিসীম সুখে মগ্ন হতে চান-

'সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিন্তু পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে ঘন্টা যায়।
মৌন ভঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর।
সেই তো সখী স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।'
(অনু-কান্তি ঘোষ)

কিন্তু এ স্বর্গ, এ সুখতো ক্ষনিকের। ক্ষণবাদী ওমরের বুকে তাই জেগে থাকে এক গভীর নৈরাশ্যময় বেদনাভার। তিনি জানেন, এ চরাচরে কিছুই স্থায়ী নয় - কিন্তু বৈভব, ঐশ্বর্য শক্তি সমস্ত কিছু একে একে বিলীন হয়ে যায় মহাকালের গর্ভে। প্রবল প্রতাপশালী যে সম্রাট তিনিও একদিন নিষ্ঠুর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাই গভীর বেদনায় কবিকে বলতে শোনা যায়—

'দেখতে পারে যেথায় তুমি গোলাপ-লালা ফুলের ভিড়
জেনো, সেথায় ঝরেলি কোন সাথানশার রুধির।'
(অনু- নজরুল)

ওমরের রুবাইগুলো এভাবেই ধারণ করেছে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো এক বেদনার প্রস্রবণ এক নিঃশব্দ একদল। এই মায়াময় পৃথিবী থেকে এবার যে চলে যায় সে আর কখনো ফেরে না। এই নির্মম খেলা জীবন মৃত্যু কে খেলছে রাত্রি দিন? কেনই বা বিধাতা কুম্ভকারের মতো জীবনকে নিয়ে আপন খেয়ালে ভাবছেন আর গড়ছেন? কবি তাই তীব্র প্রতিবাদে উচ্চারণ করেন—

'একি আজব করছ সৃষ্টি, কুম্ভকার হে, হাত থামাও।
চূর্ণ খরের মাটি নিয়ে করছ কি তা দেখতে পাও?'

ওমরের এ জিজ্ঞাসা ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। স্রষ্টার এ খেয়াল খুশিতে তিনি ক্ষুব্ধ। কখনো বা বিদ্রোহী, স্রষ্ঠাকে তিনি নানাভাবে কটাক্ষ করার প্রায়স পেয়েছেন-

দয়ার তরেই দয়া যদি, করুণাময় স্রষ্টা হন,
আদমেরে স্বর্গ হতে দিলেন কেন নির্বাসন?
পাপীর তরে করুনা যে - করুনা সেই সত্যিকার।
তাদের আবার প্রসাদ কে কয়, পুণ্য করে যা অর্জন।
(অণু- নজরুল)

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা, ন্যায়-নীতি এবং ধর্ম নিয়েও ওমরের বিদ্রূপ কোনো অংশে কম নয়। তথাকথিত ধর্ম ব্যবসায়ী ভদ্র ধার্মিকদের উদ্দেশ্যে তীব্র শ্লেষ ও ঘৃনার প্রকাশ লক্ষনীয়-

'ভন্ড যত ভড়ং করে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ,
চায়না খোদায় - লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ।'
(অনু- নজরুল)

ওমরের কাব্যে সুফীতত্ত্বের প্রভাব যেমন লক্ষ্যনীয়, তেমনি শারাব ও সাকীর প্রসঙ্গ এসেছে বার বার। যেহেতু ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন প্রেমিকের আত্মা নিবেদনই একাব্যের মূল বিষয়। তাই রূপক অর্থে ঈশ্বর প্রেমই এখানে সুরা। আর সাকী অর্থ যে আমাদের পৌঁছে দেবে তাঁর কাছে অর্থাৎ পীর, পয়গম্বর অথবা দরবেশ। আর তাঁদের অভিধানে সুরাই হলো সাধনাগারের প্রতীক।

গ্রীক নিয়তিবাদও ওমর খৈয়ামের জীবন-ভাবনায় ছায়া ফেলেছে। সৃষ্টির পূর্ব থেকে মানুষের জীবন-ধারা নির্ধারিত। সর্বত্র নিয়তি তাকে নিয়ন্ত্রিত করে - এই উপলব্ধিজাত বহু পংক্তি তাঁর কাব্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরিয়ামের মতবাদের প্রতিধ্বনি লক্ষ্যনীয় একাব্যে। অতীব বা ভাবিষ্যৎকে কেনই বা তোয়াক্কা করবো, সজাগ থাকবো শুধু বর্তমানের বেলায়। উচিত মূল্যে কিনে নেবো তাকে। জীবনটাই তো ক্ষণিকের। তাই যে দিনগুলো কেবলমাত্র আয়ত্তে, তাকেই বরণ করা ভালো সানন্দে।' এপিকিউরিয়ামের মতো ওমরও এমন এক জগতের কল্পনা করেছেন, যা যান্ত্রিক। উভয়ের ধারণা মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশ ঘটে। ভারতবর্ষে চার্বাক নীতিশাস্ত্রেও জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করবার কথা বলা হয়েছে। চার্বাক নীতিবাদীরা বলেন, 'যতদিন বাঁচবে, আনন্দে বাঁচবে। ঋণ কখণ আর ঘি খাবে'।' কিন্তু চার্বাক পন্থিদের সঙ্গে ওমরের মূল পার্থক্য এই যে, ওমর জীবনভর আনন্দ করবার কথা বললেও আপরকে বঞ্চিত করে আনন্দ করার মধ্যে কোন মহত্ত খুঁজে পাননি। বস্তুতঃ অন্যকে কষ্ট দেয়ার মধ্যে কোন প্রকৃত আনন্দ নেই। তাই ওমর বলেন——

'কারুর প্রাণে-দুখ দিও না করো বরং হাজার পাপ
পরের মনের শান্তিনাশি বাড়িও না তার মনস্থাপ।'

ওমর ছিলেন সত্যের নির্ভিক সন্ধানী। জীবন ও জগতকে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সবরকম সংস্কারমুক্ত। তাঁর সম্পর্কে কবি নজরুল বলেন, "বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানপুষ্ট কারণ- জিজ্ঞাসু মনের কাছে ওমরের কবিতা যেন আমাদেরই প্রশ্ন, আমাদেরই প্রাণের কথা, ... কেন এই জীবন, মৃত্যুইবা কেন? স্বর্গ-নরক-ভগবান বলে সত্যই কে কিছু আছে? ... ... এই চিরন্তন প্রশ্ন ওমরের জ্ঞান প্রশান্ত মনে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝড়ের মতই দোল দিয়েছিল। সেই তরঙ্গ সংঘাতের সঙ্গীত, বিলাপ ও গর্জন শুনতে পাই তাঁর রুবাইয়াতে। ওমরকে বিংশ শতাব্দীর মানুষের ভালোলাগার কারণ এই।"

নীচের সংক্ষিপ্ত উত্তর, প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. রুবাইয়াতের মূলভাব নিজের ভাষায় লিখুন।
২. সুরা ও সাকী বলতে কবি ওমর কি বুঝিয়েছেন -তা নিজের ভাষায় লিখুন।

রুবাইয়াত
নির্বাচিত পাঠ

মূলপাঠ- ১

রাতের আঁচল দীর্ণ করে আসল শুভ ঐ প্রভাত,
জাগো সাকী! সকাল বেলার খোঁয়ারি ভাঙো আমার সাথ।
ভোলো ভোলো বিষাদ-স্মৃতি! এমনি প্রভাত আসবে ঢের,
খুঁজতে মোদের এইখানে ফের, করবে করুণ নয়নপাত।

সারসংক্ষেপ

রাতের আঁচল ভেদ করে সুন্দর একটি সকালের উদয় হয়েছে। হে সাকী জাগো, আমার সঙ্গে অবসাদ দূর কর। বিষাদ স্মৃতি ভুলে যাও এখন। কেননা, এরকম শুভ সকাল আবার ও ফিরে আসবে আমাদেরই খুঁজতে। এ পৃথিবীতে যে জীবন আমরা যাপন করেছি - আমাদের অবর্তমানে সেই শূণ্যতা স্মরণ করে ঢের প্রভাত আসবে এ পৃথিবীতে এবং আমাদের জন্যে তারা অশ্রুপাত করবে। কেননা এ জীবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী।

শব্দার্থ ও টীকা

সাকী- মদ পরিবেশনকারী (আরবি)। রূপক অর্থে পীর, পয়গম্বর বা দরবেশ যে পৌঁছে দেবে ঈশ্বরের কাছে। দীর্ণ- বিদারিত। বিষাদ স্মৃতি- বেদনার স্মৃতি খোয়ারি - মদের নেশা কাটারপর অবসাদ বা গ্লানি। খোয়ারি ভাঙ্গা (আঃ খুমার) ঘুম-ঘোর ভাঙ্গা।

মূলপাঠ- ২

আঁধার অন্তরীক্ষে বুনে যখন রূপার পাড় প্রভাত,
পাখীর বিলাপ-ধ্বনি কেন শুনি তখন অকস্মাৎ?
তারা যেন দেখতে বলে উজল প্রাতের আরশিতে-
ছন্নছাড়া তোর জীবনের কাটল কেমন একটি রাত!

সারসংক্ষেপ

রাতের অন্ধকার শেষে আকাশে যখন রূপার পাড়ের মতো প্রভাত আসে - তখন কেন হঠাৎ পাখির বিলাপ ধ্বনি শুনতে পাই? উজ্জ্বল প্রভাতের আয়নায় নিজেকে দেখতে বলে এই পাখিকুল। ছন্নছাড়া ক্ষনস্থায়ী জীবনের একটি রাত কিভাবে কত অনায়াসে কেটে গেল কে তার হিসেব রাখে। এই রূপ রস গন্ধময় পৃথিবী থেকে একবার চলে গেলে কেউ আর ফিরে না। কাজেই জীবন মৃত্যুর এ খেলাঘরে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ভরে তুলতে হবে আনন্দে। প্রতিটি রাতকে উপভোগ্য কার কাটাতে হবে। পাখির বিলাপ ধ্বনিতে তারই প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পেয়েছেন কবি।

শব্দার্থ ও টীকা

অন্তরীক্ষ - আকাশ
অকস্মাৎ - হঠাৎ
উজ্জল - উজ্জ্বল, প্রাতে - সকালবেলা
আরশিতে - আয়নায়
ছন্নছাড়া - আশ্রয়হীন

মূলপাঠ- ৩

"ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস?" কইল ঋষি স্বপ্নে মোর,
"আনন্দ-গুল্ প্রস্ফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর?
ঘুম মৃত্যুর যমজ-ভ্রাতা তার সাথে ভাব করিসনে,
ঘুমি দিতে ঢের পাবি সময় কবরে তোর জনম-ভোর।"

সার-সংক্ষেপ

জীবন ক্ষনস্থায়ী। স্বল্পপরিসরের এই জীবনে ঘুম মৃত্যুরই দোসর। কবি এখানে ঘুমকে মৃত্যুর যমজ-ভাই হিসেবে কল্পনা করেছেন। স্বপ্নে ঘুমের ভেতর কোন এক ঋষি - কবিকে বলছেন, এই সংক্ষিপ্ত জীবন যদি ঘুমিয়ে কাটাও - তবে জীবনের আনন্দ - গোলাপ কখন ফোটাবে। যতক্ষণ জীবন আছে - ততক্ষন তা উপভোগ কর নানভাবে। জীবন থেকে নিংড়ে নিতে হবে তার আনন্দ রস। ঘুমের জন্যে অনেক সময় পড়ে আছে। কেননা, কবরে শুয়ে মানুষ অনন্তকাল ঘুমাতে পারে - তাই কবির আহবান - ঘুমিয়ে বৃথা সময় নষ্ট না করে তা উপভোগ কর।

শব্দার্থ ও টীকা

ঋষি - শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী।
আনন্দ-গুল - আনন্দের গোলাপ
প্রস্ফুটিত - পূর্ণ বিকশিত
যমজ-ভ্রাতা - একসঙ্গে একই গর্ভজাত ভাই।

মূলপাঠ- ৪

আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুকটুক শীরীন ঠোঁট
গজল শোনাও, শিরাজী দাও, তন্বী সাকী জেগে ওঠ!
লাজ-রাঙা তোর গালের মত দে গোলাপী-রঙ শরাব,
মনে ব্যথার বিনুনী মোর খোঁপায় যেমন তোর চুনোট।

সারসংক্ষেপ

কবি ওমর রাতের জীবনকে কিভাবে উপভোগ্য করে তুলতে হয় তারই বর্ণনা দিয়েছেন। প্রেম, প্রেমাস্পদ, প্রেম-সঙ্গীত এবং প্রেমিকার লাজ-রাঙা গালের মত গোলাপী রঙের শরাব পান করে তিনি তাঁর বেদনা ভুলতে চাইছেন। কবির অন্তরের ব্যথাকে বিনুনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবং প্রেমিকার খোঁপায় যেমন চুনোট সেইরকম কবি হৃদয়ের বিষাদ ও আজ দৃশ্যমান। শিল্পের মন্যে শিল্পীর যে অর্ন্তচিহ্নিত বেদনা - তার কোন উপশম নেই। একই বোধের প্রকাশ লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে - অলৌকিক আনন্দের ভাব/বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার/তার নিত্য জাগরণ।

কবির শৈল্পিক বেদনারই প্রকাশ ঘটেছে এখানে। কবি যেন তাঁর সুন্দরী তন্বী সাকীর সঙ্গে রাত জেগে ভাগ করে নিতে চাইছেন - এই দুঃখকে।

শব্দার্থ ও টীকা

খোরাক - খাদ্যদ্রব্য, খাওয়ার পরিমান।
শীরীন - সুমিষ্ট, মধুর, মনোহর।
শীরীন ঠোঁট - (কাঃ) সুন্দর ঠোঁট অর্থে।
গজল - (আরবী) সঙ্গীতের সুর বিশেষ। কবিতাবিশেষ, প্রেমসঙ্গীত।
তন্বী - একহারা
শরাব - মদ্য, সুরা (আঃ)
চুনোট - কোঁচান, সঙ্কোচন বা কুঞ্চন।

মূলপাঠ- ৫

প্রভাত হ'ল! শরাব দিয়ে করব সতেজ হৃদয়-পুর,
যশোখ্যাতির ঠুনকো এ কাচ করব ভেঙে চাখ্‌নাচুর।
অনেক দিনের সাধ আশা এক নিমেষে করব ত্যাগ,
পরব প্রিয়ার বেণী বাঁধন, ধরব বেণুর বিধুর সুর!

সারসংক্ষেপ

কবির জন্যে রাত হলো আনন্দময় ঘন-যামিনী। দিলের বেলা কোলাহলময় রূপ বাস্তবতায় কবির কল্পনার জগৎ ভেঙে খান খান হয়ে যায়। কাজেই দিনের শুরু - প্রভাত হতেই কবির হৃদয় নির্জীব হয়ে পড়বে ভয়ে তা শরাব দিয়ে সতেজ রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। কাব্য যেমন কবিকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয় - তেমনি খ্যাতির বিড়ম্বনা তাঁকে স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ থেকে দূরে ঠেলে দেয় - কবি তাই প্রতিবাদ মুখর হয়েই যেন বলেছেন, যশোখ্যাতির ঠুনকো একাব ভেঙে নেশার অনুপানরূপ মুখরোচক খাদ্য চা............চুরে পরিণত করবে। এবং অস্কেদিনের সাধ ইচ্ছা মুহূর্তে পরিত্যাগ করে প্রিয়ার বেশীর বাঁধনে ধরা দেবেন। বাঁশির করুন সুরকে কাঠ ধারণ করবেন। প্রেমের জন্যে সকল দুঃখকে বরণ করে নেবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। এ রুবাইটিতে।

শব্দার্থ ও টীকা

হৃদয়পুর - হৃদয়ের ভিতর
যশোখ্যাতি - কীর্তি, বা গৌরব প্রচার।
চাখনাচুর - নেশার অনুপানরূপে ব্যবহৃত মুখরোচক খাদ্যবিশেষ।
ঠুনকো - ক্ষনস্থায়ী, ভঙ্গুর, সহজেই ঠুন্ করে ভাঙে এমন।
বেণী - বিণনী, বেণু - বাঁশি।

মূলপাঠ- ৬

ওঠো, নাচো! আমরা প্রচুর কর্‌ব তারিফ মদ-অলস
ঐ নার্গিস্ আঁখির তোমার, ঢালবে তুমি আঙুর-রস!
এমন কী আর-যদিই তাহা পান করি দশ বিশ গেলাস,
ছয় দশে ষাট পাত্র পড়লে খানিকটা হয় দিল সরস!

সারসংক্ষেপ

সুরা ও সাকীকে নিয়ে অপারিসীম সুখে মগ্ন হতে চেয়েছেন কবি। মদের নেশায় বিহবল কবি তাঁর নাচের প্রশংসা, তাঁর নার্গিস কুলের মতো চোখের প্রশংসা করবেন বলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। হে সাকী, তুমি যদি ঢেলে দাও। তাহলে দশ বিশ গেলাস' আঙ্গুর রস পান করেও আমার নেশা হবে না। বরং ছয় দশে ষাট পাত্র পেটে পড়লে তবেই যদি নেশায় দিল খানিকটা সরস হয়। এখানে যে, সরাব ও সাকীর কথা বলা হয়েছে তা নিছক বস্তুজগতের উপাচার নয়্রীশ্বর প্রেমে মগ্ন প্রোমীর আত্মনিবেদনই প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বর প্রেমই হলো সুরা। সাকীর অর্থ যে আমাদের পৌঁছে দেবে তাঁর কাছে অর্থাৎ পীর, পয়গম্বর দরবেশ। আর সুরাই এখানে সাধনাগারের প্রতীক।

শব্দার্থ ও টীকা

তারিফ - প্রশংসা
নার্গিস - ফুল বিশেষ, আঁখি - চোখ
আঙুর রস - দ্রাক্ষারস, যা পান করে নেশা হয়।
মদ-অলস - মদ্যপানের ফলে বা আবেশহেতু বিহবল।

মূলপাঠ- ৭

তোমার রাঙা ঠোঁটে আছে অমৃত-কূপ প্রাণ-সুধার,
পিয়ালার ঠোঁট যেন গো ছোঁয় না, প্রিয়া, ঠোঁট তোমার!
ঐ পিয়ালার রক্ত যদি পান না করি, শাপ দিও,
তোমার অধর স্পর্শ করে এত বড স্পর্ধা তার!

সার-সংক্ষেপ

তোমার রাঙা ঠোঁটে প্রাণ-সুধার অমৃতের কূপ লুকিয়ে আছে। হে প্রিয়া পেয়ালার ঠোঁট যেন তোমার ঠোঁটকে স্পর্শ করতে না পারে - সেদিকে খেয়াল রেখো। পেয়ালার রক্ত যদি পান না করি তাহলে আমাকে তুমি অভিশাপ দিও। তোমার অধর স্পর্শ করবো এতো সাহস বা স্পর্ধা নেই আমার।

শব্দার্থ ও টীকা

অমৃত - যা পান করে মৃত্যুকে এড়ান যায়,
অমৃত-কূপ - যে কূপের মধ্যে - অমৃত থাকে।
প্রাণ -সুধার - প্রাণ উজ্জীবনকারী যে সুধা।
অধর - নিচের ঠোঁট
স্পর্শ - ছোঁয়া
স্পর্ধা - সাহস

মূলপাঠ- ৮

আজকে তোমার গোলাপ-বাগে ফুটল যন রঙীন গুল্
রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফজুল।
পান করে নে, সময় ভীষণ অবিশ্বাসী, শত্রু ঘোর,
হয়ত এমন ফুল-মাখানো দিন পাবি না আজের তুল।

সারসংক্ষেপ

জীবনবাদী কবি ওমর খৈয়াম জীবনের একটি দিনকেও নিরানন্দ বৃথা যেতে দিতে চান না। কেননা, এ জীবন অর্থহীন। শুধু যাওয়া শুধু আসা, শুধু স্রোতে ভাসা। এই ক্ষনস্থায়ী জীবনের গোলাপ বাগানে যখন রঙিন ফুল ফুটেছে তখন আর পান পত্রের বেকার রেখে লাভ নেই। নেশার আনন্দটুকু আজ উপচে পড়ুক। সময় ভয়ানক অবিশ্বাসী কেননা, কালস্রোতে ভেসে যায় মাখানো দিন আর আসবে না হয়তো জীবনে। কাজেই বর্তমানের সুন্দর মুহূর্তকে বৃথা, নিরানন্দ যেতে দিতে নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

গুল - গোলাপ ফুল
গোলাপ-বাগে - গোলাপ ফুলের বাগানে
পান-পাত্র - যে পাত্রে নেশার জন্যে মদ ঢেলে পান করা হয়।
আবিশ্বাসী - যে বিশ্বাস রাখেনি।
তুল - তুলনায়

মূলপাঠ- ৯

শরাব আনো! বক্ষে আমার খুশির তুফান দেয় যে দোল্।
স্বপ্ন-চপল ভাগ্যলক্ষ্মী জাগল জাগো ঘুম-বিভোল!
মোদের শুভদিন চলে যায় পারদ-সম ব্যস্ত পা'য়,
যৌবনের এই বহ্নি নিভে খোঁজে নদীর শীতল কোল।

সার-সংক্ষেপ

বুকে আজ আমার খুশীর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। হে সাকী, শরাব আনো। এতোদিন ঘুমে বিভোর ছিলো যে, ভাগ্যলক্ষ্মী - কে আজ জেগে উঠেছে স্বপ্নচঞ্চল। আজ আমার আনন্দের দিন। কিন্তু সময় অবিশ্বাসী। খুবই দ্রুত চলে যায় জীবন থেকে। আমাদের শুভ দিন, শুভ মুহূর্তগুলো পারদের মতে ব্যস্ত পায় চলে গেছে। যৌবনের আগুন নিভে গিয়ে তা আশ্রয় নিয়েছে নদীর শীতল কোনে। ক্ষনস্থায়ী এ জীবনে সবই নিমিষে হারিয়ে যায়। সুখতো ক্ষনিকের। এ চরাচরে কিছুই স্থায়ী নয়, চিত্ত, বৈভব, ঐশ্বর্য, জীবন, যৌবন সবই একে একে বিলীন হয়ে যায় মহাকালের গর্ভে - এই ভয়ংকর সত্য ব্যক্ত হয়েছে ওখানে।

শব্দার্থ ও টীকা

তুফান - ঝড়, বিভোল - বিহবলের কোমল রূপ।
ভাগ্য - অদৃষ্ট, নিয়াতি, ভাগ্যলক্ষী
পারদ - তরল ধাতু বিশেষ। বহ্নি - আগুন

মূলপাঠ- ১০

আমরা পথিক ধূলির পথের, ভ্রমি শুধু একটি দিন,
লাভের অঙ্ক হিসাব করে পাই শুধু দুখ, মুখ মলিন।
খুঁজতে গিয়ে এই জীবনের রহস্যেরই কূল বৃথাই
অপূর্ণ সাধ আশা লয়ে হবই মৃত্যুর অঙ্কলীন।

সারসংক্ষেপ

এই পৃথিবী দুদিনের পান্থশালা। আমরা প্রত্যেকে এই জীবন পথের পথিকমাত্র। একটি দিনের জন্যে আমাদের এই ভ্রমণ। এই স্বল্পতম সময়ের এই জীবনে লাভের অঙ্ক হিসাব করতে গেলে কেবল দুঃখই বাড়ে। এই জীবনের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টাও অর্থহীন। কেনইবা জীবনও মৃত্যু নিয়ে স্রষ্টার এই নির্মম খেলা? কেন বিধাতা কুম্ভকারের মতো জীবনকে নিয়ে আপন খেয়ালে ভাবছেন আর গড়ছেন। কেনইবা মানুষ তাঁর সাধ আহলাদ অপূর্ণ রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এমন অগনিত জিজ্ঞাসা মানবমনে চিরকাল রহস্যের জন্ম দিয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

ভ্রমি - ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ান।
দুখ - দুঃখ, অপূর্ন - যা পূর্ণতা পায়নি।
অঙ্কলীন - চিহ্নহীন

মূলপাঠ- ১১

ধরায় প্রথম এলাম নিয়ে বিস্ময় আর কৌতূহল,
তারপর-এ জীবন দেখি কল্পনা, আঁধার অতল।
ইচ্ছা থাক কি না থাক, শেষে যেতেই হবে, তাই বলি-
এই যে জীবন আসা-যাওয়া আঁধার ধাঁধার জট কেবল!

সারসংক্ষেপ

এজীবন অসীম শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহনের পর প্রতিনিয়ত বিস্ময় আর কৌতুহলের মুখোমুখি হতে থাকে। তারপর বিস্তৃত হতে থাকে তার কল্পনার জগত - আবার অতি দ্রুত তা হারিয়ে যায় আঁধারের অতলে। কাজেই এ জীবন কবির কাছে অর্থহীন বলে প্রতিভাত হয় কখনো কখনো। তাইতো ইচ্ছা থাক বা থাক তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেই হয়।

শব্দার্থ ও টীকা

ধরা - পৃথিবী
বিস্ময় - আশ্চর্য, চমৎকৃত ভাব বা অবস্থা।
ধাঁধা - দৃষ্টিভ্রম, ধোঁকা, সংশয় বা বুদ্ধিবিভ্রমকারী প্রশ্ন।
আঁধার - অন্ধকার

মূলপাঠ- ১২

রহস্য শোন সেই সে লোকের আত্মা যথায় বিরাজে,
ওরে মানব! নিখিল সৃষ্টি লুকিয়ে আছে তোর মাঝে।
তুই-ই মানুষ, তুই-ই পশু, দেব্‌তা দানব স্বর্গদূত,
যখন হতে চাইবি রে যা হতে পারিস তুই তা যে।

সারসংক্ষেপ

আত্মা যেখানে বিরাজ করে অর্থাৎ মানুষের দেহের ভেতরে লুকিয়ে আছে নিখিল সৃষ্টির সকল রহস্য। মানুষের মধ্যে আছে সেই অপরিমিত শক্তি - যা আত্মশক্তি। এই শক্তি বলেই মানুষ নিজেকে যেমন দেবতান্তরে নিয়ে যেতে পারে - তেমনি সেই শক্তির অপচয়ে নিজেকে পশুতে পরিনত করতে পারে। দানব এমনকি স্বর্গদূত ও হতে পারে যদি সে হতে চায় এমন কিছু। অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তার স্বরূপে, আত্মনিবেদনের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রেমের কথাই ব্যক্ত হয়েছে এখানে। জাগতিক মোহমায়ার ঊর্ধ্বের উর্ধে পরম সত্তার কাছে পরিপূর্ণ আত্মবিলোপকেই মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে এখানে।

শব্দার্থ ও টাকা

রহস্য - গূঢ় তাৎপর্য বা মর্ম
আত্মা - দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যময় সত্তা, হৃদয়, মন
নিখিল - সমুদয়
স্বর্গ - পুণ্যবানেরা মৃত্যুর পরে যে স্থানে বাস করেন, দেবলোক।
দানব - দনুর পুত্র, অসুর, দৈত্য। দেবতা - স্বর্গলোকের বাসিন্দা।

মূলপাঠ- ১৩

স্রষ্টা যদি মত নিত মোর - আসতাম না প্রাণান্তেও,
এই ধরাতে এসে আবার যাবার ইচ্ছা নেই মোটেও।
সংক্ষেপে কই, চিরতরে নাশ করতাম সমূলে
যাওয়া-আসা জন্ম আমার; সেও শূন্য শূন্য এও!

সারসংক্ষেপ

স্রষ্টা যদি আমার মতামত নিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতে চাইতো - তাহলে কখনো আমি আসতাম না - কেননা, এ জীবন অর্থহীন। শুধু যাওয়া শুধু আসা শুধু স্রোতে ভাসা। অন্ধকার এক রহস্য লোক থেকে মানুষের আর্বিভাব - আর এক অসীমলোকে তার যাত্রা। মধ্যখানে কদিনের পান্থশালা। এ পান্থশালায় আসার জন্যে যেমন কবি মোটেও আগ্রহী ছিলেন না, তেমনি এ আনন্দময় ধরণী ছেড়ে চলে যেতেও ইচ্ছে নেই তাঁর মোটে। এই রূপরস-গন্ধময় জগতে প্রাণ বারবার ফিরে আসতে চায়, কিন্তু মন জানে কোনোদিনও সে ফিরে আসতে পারবেনা - তাই ক্ষনকালীন এ জীবনের জন্যে কাতরতা ও আর্তি অনুভব করেন কবি।

শব্দার্থ

স্রষ্টা - ঈশ্বর
ধরা - পৃথিবী
প্রাণ - জীবন
নাশ - ধ্বংস
সমূলে - মূলসহ।

মূলপাঠ- ১৪

আত্মা আমার! খুলতে যদি পারতিস এই অস্থিমাস,
মুক্ত পাখায় দেব্‌তা-সম পালিয়ে যেতিস্ দূর আকাশ।
লজ্জা কি তোর হ'ল না রে, ছেড়ে তোর ঐ জ্যোতির্লোক
ভিন্-দেশী প্রায় বাস করতে এলি ধরার এই আবাস?

সারসংক্ষেপ

মানুষের দেহ নশ্বর। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। অস্থিমজ্জাময় দেহের শৃঙ্খল খুলে আত্মা যদি দেবতাদের মতো মুক্ত পাখায় ভর করে দূর আকাশে পালিয়ে যেতে পারে - তাহলে আর ভয় কিসের? কিন্তু আত্মা তার সে বিচরন ক্ষেত্র - জ্যোতির্লোক ছেড়ে এই ভিনদেশে ভিন্ন আবহাওয়ায় কেন সে বাস করতে এলো এই ধরায়। এই চিরন্তন আক্ষেপ ব্যক্ত হয়েছে এখানে। কেননা, দেহ থেকে আত্মার স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। দেহ লয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা ও লয় ঘটে। কেন এই জীবন, মৃত্যুই বা কেন? এই মৌলিক প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এ রুবাই। ওমরের অধ্যাত্ম চেতনার প্রকাশ ঘটেছে এখানে।

শব্দার্থ ও টীকা

আত্মা - দেহে অধিষ্ঠিত চৈতন্যময় সত্তা
অস্থিমাস - হাড় ও মজ্জা
জ্যোর্তিলোক - গ্রহ, নক্ষত্রের আলোতে পূর্ণপথ।

মূলপাঠ- ১৫

সকল গোপন তত্ত্ব জেনেও পার্থিব এই আবহাওয়ার
মিথ্যা ভয়ের ভয় গেল না? নিত্য ভয়ের হও শিকার?
জানি স্বাধীন ইচ্ছামত যায় না চলা এই ধরায়,
যতটুকু সময় তবু পাও হাতে, লও সুযোগ তার।

সারসংক্ষেপ

এই রূপ-রসগন্ধময় পৃথিবীতে মানুষ আসে ক্ষণিকের জন্যে। জগতের সবকিছু অনিত্য এবং মৃত্যুর পর কি আছে তাও মানুষের অজানা - এই সব গোপনতত্ত্ব। পার্থিব জগতের আবহাওয়া জানার পরও মানুষের মিথ্যে ভয়ের ভয় কখনো কাটেনা। নিত্য সে ভয়ের শিকার হয়ে যায়। নিজের ইচ্ছে মতো স্বাধীনভাবে চলা-যায় না এ পৃথিবীতে। নানান প্রতিকুলতা ও প্রতিবন্ধকতা উজিয়ে চলতে হয় এ ধরায়। এ দুনিয়ায় কোনো কিছুর মূল্য নেই, কোনো কিছুর অর্থ নেই। এই অর্থহীন দুনিয়ায় মানুষের একরাত্রির মুসাফির মাত্র। কাজেই যেটুকু সময় পাওয়া যায় - তা আনন্দে বিভোর হয়ে কাটানোই বুদ্ধিমানের কাজ। অর্থাৎ নগদ যা পাও হাত পেতে নাও। ক্ষণবাদী জীবনের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

পার্থিব - পৃথিবী সম্পর্কিত যা কিছু।
আবহাওয়া - জলবায়ু
স্বাধীন - মুক্ত

মূলপাঠ- ১৬

ব্যথায় শান্তি লাভের তরে থাকত যদি কোথাও স্থান
শ্রান্ত পথের পথিক মোরা সেথায় জুড়াতাম এ প্রাণ।
শীত-জর্জর হাজার বছর পরে নবীন বসন্তে
ফুলের মত উঠত ফুটে মোদের জীবন-মুকুল ম্লান।

সারসংক্ষেপ

সুখতো ক্ষণিকের। দুঃখ মানুষের নিত্যসঙ্গী। তবু ব্যথা ও দুঃখ নিরাময়ের জন্যে মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা। ঘাত প্রতিঘাতময় পৃথিবীর পথে চলতে চলতে শ্রান্ত পথিক যারা - আজ তারাও ব্যথাভুলে শান্তি লাভের আশায় খুঁজে ফেরে এমন স্থান। যেন শীতের কষ্ট জর্জিত হাজার বছর কাটাবার পরে প্রকৃতিতে বসন্ত এলে যেমন ফুলে ফুলে ভরে ওঠে প্রকৃতি। দক্ষিনা বাতাসে আনন্দময় হয়ে ওঠে চারিদিক - চিরদুঃখী মানুষের দুঃখ ভোলার। ব্যথা নিরাময়ের স্থান যদি সত্যি খুঁজে পাওয়া যেত তবে তা হয়ে উঠতে আমাদের জন্য শীতের পরে নবীন বসন্তের আগমনের মাতা।

শব্দার্থ ও টীকা

ব্যথা - বেদনা, শ্রান্ত - ক্লান্ত
শীত-জর্জর - শীতজর্জরিত, ম্লান - মলিন

মূলপাঠ- ১৭

বুলবুলি এক হালকা পাখায় উড়ে যেতে গুলিস্তান,
দেখল হাসিখুশী ভরা গোলাপ লিলির ফুল-বাথান।
আনন্দে সে উঠল গাহি, "মিটিয়ে নে সাধ এই বেলা,
ভোগ করতে এমন দিন আর পাবিনে তুই ফিরিয়ে প্রাণ!"

সারসংক্ষেপ

গায়ক পাখি বুলবুলি হালকা পাখায় উড়ে যেতে যেতে গোলাপ ও লিলি ফুলের বাগান দেখে আনন্দে সে গেয়ে উঠলো গান। 'মিটিয়ে নে সাধ এই বেলা' - জীবন উপভোগ্য করে তোলার জন্যে এরকম দিন আর ফিরে পাবে কেউ। অতীত যেখানে মরীচিকা, ভবিষ্যৎ অন্ধকার - সেখানে বর্তমান একমাত্র সত্য। তাই ওমরের উপলব্ধি - পৃথিবী মিথ্যা, স্বর্গ মিথ্যা, পাপ-পুণ্য মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, আমি মিথ্যা, সত্য মিথ্যা, মিথ্যা মিথ্যা - একমাত্র সত্য - যে মুহূর্ত হাতের মুঠোয় এলো তাকে চুটিয়ে ভোগ করা। অর্থাৎ ক্ষণবাদী, জীবনবাদী কবি ওমর জীবনের বর্তমানের সত্য মূল্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন এখানে। দুদিনের জীবন - যতোটা সম্ভব - তাকে সুন্দরকার উপভোগ্য করে তোলাই হবে - বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ জীবন থেকে যে দিনটি ঝরে যাবে তা আর কখনো ফিরে আসবে না, এটাই নির্মম সত্য।

শব্দার্থ ও টীকা

বুলবুলি - গায়ক পাখি বিশেষ।
গুলিস্থান - গোলাকার কোন্ স্থান।
বাথান - গোশালা, গোচারণ ভূমি, [এখানে ফুলের -বাথান অর্থ ফুলের বাগান]

মূলপাঠ- ১৮

রূপ-মাধুরীর মায়ায় তোমার য'দিন পার, লো প্রিয়া,
মোতার প্রেমিক বধূর ব্যথা হরণ করো প্রেম দিয়া!
রূপ-লাবণীর সম্ভার এই রইবে না সে চিরকাল,
ফিরবে না আর তোমার কাছে যায় যদি বিদায় নিয়া।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। রূপ-যৌবন, চিত্ত, বৈভব, ঐশ্বর্য - সবকিছুই একে একে বিলীন হয়ে যায় মহাকালের গর্ভে। কাজেই এখানে কবি তার প্রিয়াকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমার রূপ যৌবন, প্রেম ভালোবাসা দিয়ে প্রেমিকবন্ধুর বিষাদ ও বেদনা দূর করো। কেননা আজ তোমার যে রূপ-লাবন্যের সম্ভার রয়েছে তা চিরকাল থাকবে না। এবং তোমার প্রেমিক ও আর তোমার কাছে ফিরে আসবে না - যদি সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে বলে যায় একবার। কাজেই বর্তমান সময়কে ভরে প্রেমেও আনন্দে। মহাকালের থাবায় একদিন শেষ হবে আমাদের রূপ-লাবণ্য শেষ হবে আমাদের প্রেমের দিন রাত্রি - কাজেই সকল বিষাদ ভুলে জীবনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

শব্দার্থ ও টীকা

রূপ-মূর্তি, শরীর। রূপ - মাধুরী = সৌন্দর্য, শোভা
প্রিয়া - প্রেমিকা, বধূ - বউ।

মূলপাঠ- ১৯

সাকী! আনো আমার হাতে মদ-পেয়ালা, ধরতে দাও!
প্রিয়ার মতন ও মদ-মদির সুরত-ওয়ালী ধরতে দাও!
জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীরে বেঁধে যা' দেয় গাঁট-ছড়ায়,
সেই শরাবের শিকল, সাকী, আমায় খালি পরতে দাও।

সারসংক্ষেপ

হে সাকী, তুমি সুরা পরিবেশন করো। আমার হাতে মদের পেয়ালা তুলে দাও। মদের পেয়ালা আমাকে এমনভাবে ধরতে দাও - যেভাবে প্রিয়াকে স্পর্শ করে তার প্রেমিক - অথবা মদ-মদির সুশ্রী সুন্দরীকে যেভাবে কেউ স্পর্শ করে - মদের পেয়ালাটাকে আমাকে সেভাবেই ধরতে দাও হে সাকী। যে সুরা পান করে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই বন্ধনে নিজেদের আপন করে নেয় - সেই শরাবের শিকল আমাকে পরতে দাও সাকী। জীবনের রূঢ় বাস্তবতা মানব সম্পর্কের মধ্যে অনেক দূরত্ব রচনা করে - স্বজনকে ঠেলে দেয় আরো অনেক দূরে। কিন্তু একমাত্র সুবাপানেই মানুষ ভুলে যেতে পারে - তার অতীত ও ভবিষ্যৎ। কাছে টানতে পারে প্রবল শত্রুকে। কাজেই সুরাপানের মধ্যেই কবি আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

সুরত - চেহারা আকৃতি [আঃ সুরৎ]
গাঁট - গেরো, বাঁধন।

মূলপাঠ- ২০

নীল আকাশের নয়ন ছেপে বাদল-অশ্রুজল ঝরে,
না পেলে আজ এই পানীয় ফুটত না ফুল বন ভরে।
চোখ জুড়াল আমার যেমন আজ এ ফোটা ফুলগুলি,
মোর কবরে ফুটবে যে ফুল - কে জানে হায় কার তবে!

সারসংক্ষেপ

নীল আকাশের নয়ন ছেপে বাদল ঝরছে যেন অশ্রুজল। এই বাদলের জল না পেলে ফুল দেখে আজ আমাার চোখ জুড়িয়ে গেল। একদিন হয়তো এভাবেই ফুল ফুটবে - ঝরে পড়বে আমার কবরের উপর - কিন্তু সেদিন আমি থাকবো না। অন্য কেউ হয়তো সেই ফুলের সৌরভ নেবে। আনন্দে ভরে উঠবে অন্য কারও মন। অর্থাৎ মানুষের যত জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-তত্ত্ব সব মিথ্যে। আসল সত্য এই যে, মানুষকে একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং মাটির তলে চিরনিদ্রায় শায়িত হতে হবে। সেদিন ফুল ঝরবে হয়তো অন্য কারও তরে। মহাকাল বসন্তের দিকে বয়ে চলেছে। তার বিরাম নেই। ভ্রুক্ষেপ নেই কারও জন্যে। এই সত্য ব্যক্ত হয়েছে এখানে।

শব্দার্থ ও টীকা

অশ্রুজল - চোখের জল।
নয়ন - চোখ, পানীয় - পানযোগ্য, পান করা হয় এমন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

[নীচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভার করে পড়ুন। সেসব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেওয়া হয়নি, সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।]

১. রুবাই কোন জাতীয় রচনা? এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. রুবাইয়াতের মূল ভাববস্তু নিজের ভাষায় লিখুন।
৩. সুরা ও সাকী কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? তা ব্যাখ্যা করুন।
৪. ক্ষণবাদী জীবনদর্শন কি? আলোচনা করুন।
৫. রুবাইয়াতে আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৬. বাংলাসাহিত্যে রুবাইয়াতের জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৭. ওমরের কাব্য-দর্শন আলোচনা করুন।

নমুনা

প্রশ্নঃ সুরা ও সাকী কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আলোচনা করুন।

ওমরের রুবাইগুলো রচিত হয়েছিল তাঁর অবকাশ যাপনের ফাঁকে-ফাঁকে। জীবনবাদী কবি ওমরের রুবাইগুলোতে বার বার ঘুরে - ফিরে ব্যবহৃত হয়েছে সুরা ও সাকী প্রসঙ্গ। ইরানে সাধারণত কবিরা শরাবকে সত্যিকার মদ বলে ধরে নেন না। তারা শরাব বলতে আনন্দ ভূমানন্দকে বোঝেন - যে আনন্দ রূপিনী সুধার নেশায় তাপস ঋষি সংসারের সব দুঃখ বেদনা ভুলে গিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকেন। সাকী বলতে বোঝেন, মুর্শিদকে, গুরুকে যিনি সেই আনন্দ শরাব পরিবেশন করেন। আর সুরা হলো সেই সাধনাগারের প্রতীক।

R¾c J Am^¡l

বাংলা কবিতার ছন্দ

ইউনিট- ১

ছন্দ পরিভাষা ও সূত্রাবলী

ভূমিকা

কবিতার ছন্দ বাইরের কোন পোশাকী বস্তু নয়; ছন্দ কবিতারই অন্তর্গত। এই কারণে যা কবিতা নয় তার ছন্দ-বিচার কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে অবান্তর। কোন ভাষার কবিতার ছন্দের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কেবল সে ভাষার উৎকৃষ্ট কাব্যসমূহ আলোচনার দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব। বাংলা কবিতার ছন্দও চর্যাপদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা কবিতার ধারার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং এর ছন্দ সেই ক্রমবিবর্তনের স্বাক্ষরবাহী। এই ক্রমবিবর্তনের পরিচয় সন্ধানের পূর্বে ছন্দের কতগুলো সূত্র ও পরিভাষার সংজ্ঞার্থ প্রদান আবশ্যক। তাই আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত দুটি পাঠে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

পাঠ- ১ ঃ ধ্বনি, অক্ষর, মাত্রা ও যতি সম্পর্কিত সংজ্ঞার্থে
পাঠ- ২ ঃ পংক্তি, পর্ব, প্রস্তর ও স্তবক সম্পর্কিত সংজ্ঞার্থ

পাঠ- ১ ঃ ধ্বনি, অক্ষর, মাত্রা ও যতি সম্পর্কিত সংজ্ঞার্থ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ধ্বনি, অক্ষর, মাত্রা ও যতির সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- ধ্বনি, অক্ষর, মাত্রা ও যতির শ্রেণীবিভাগের পাশাপাশি এদের উদাহরণও সনাক্ত করতে পারবেন।

ধ্বনি

সংজ্ঞার্থ ঃ মানুষ বাক্ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে আওয়াজ করে তাকে ধ্বনি বলে। ভাষার ধ্বনি দুই ধরনেরঃ
১. স্বরধ্বনি ২. ব্যঞ্জনধ্বনি

১. স্বরধ্বনি ঃ যে সমস্ত ধ্বনি উচ্চারণকালে ফুসফুস নির্গত বাতাস কণ্ঠনালী বা মুখ গহ্বরের কোন স্থানে আটকে যায় না, কেবল জিহ্বা, চোয়াল ও ঠোঁটের অবস্থাভেদ ঘটে তাকে স্বরধ্বনি (vowel) বলে। বাংলা স্বরধ্বনিগুলো হচ্ছে–

অ, আ, ই, অ্যা, উ, ও, এ

২. ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ যে সমস্ত ধ্বনি উচ্চারণকালে ফুসফুস নির্গত বাতাস মুখবিবর বা কণ্ঠনালীর কোন না কোন স্থানে আটকে যায় তাকে ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে। বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ ইত্যাদি।

অক্ষর

সংজ্ঞার্থ ঃ এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টির নাম অক্ষর (syllable)।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে Syllable -এর বাংলা করেছেন 'ধ্বনি'। তাঁর অনুসরণে প্রবোধচন্দ্র সেন closed syllable কে 'যুগ্মধ্বনি' এবং syllable কে 'অযুগ্মধ্বনি' বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে ধ্বনিতত্ত্ব, ধ্বনিবিজ্ঞান, স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি প্রভৃতি প্রয়োগে ধ্বনির একটি নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থ প্রতিষ্ঠিত। তাই syllable -এর পরিভাষা হিসেবে আমাদের বিবেচনায় অক্ষর -এর ব্যবহারই যথেষ্ট। অক্ষর দুই প্রকার। যথা–

১. মুক্তাক্ষর (Open syllable) ২. বদ্ধাক্ষর (closed syllable) মুক্তাক্ষর- যে সমস্ত অক্ষর উচ্চারণকালে আটকে যায় না (ইচ্ছেমত টেনে পড়া যায় বা প্রয়োজন মত প্রলম্বিত করা যায়) তাকে যুক্তাক্ষর বলে। যেমন- /কি/, /কে/, /হ্যা/, /চ/ ইত্যাদি। বাংলা তিন শ্রেণীর ছন্দেই মুক্তাক্ষর সাধারণত একমাত্রার।

বদ্ধাক্ষর– যে সমস্ত অক্ষর উচ্চারণকালে আটকে যায় তাকে বদ্ধাক্ষর বলে। যেমন- /দিন্/, /দেন্/, /ধ্যান্/, /শন্/, /চুন/ ইত্যাদি। বদ্ধাক্ষর স্বরবৃত্ত ছন্দে একমাত্রা, মাত্রাবৃত্তছন্দে সাধারণত দুই মাত্রা এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সাধারণত আদি ও মধ্যে একমাত্রা ও শেষে দু'মাত্রা।

বাংলা ছন্দে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরের মাত্রা গণনারীতি একটি তালিকা আকারে নিম্নে প্রদান করা হল–

ছন্দ	মুক্তাক্ষর	বদ্ধাক্ষর
স্বরবৃত্ত	১	১
মাত্রাবৃত্ত	১	২
অক্ষরবৃত্ত	১	১/২ (আদি ও মধ্যে ১। শেষে)

মাত্রা

সংজ্ঞার্থ–

বাংলা কবিতার ছন্দে ব্যবহৃত একটি অক্ষর উচ্চারণের নিম্নতম কাল পরিমাণকে মাত্রা বলে।

যেহেতু মুক্তাক্ষর তিন প্রকার ছন্দেরই একমাত্রা হিসেবে গণ্য হয় সেহেতু স্বাভাবিক ভাবে একটি মুক্তাক্ষর উচ্চারণের সময় বা কাল পরিমাণকে একমাত্রার সাধারণ পরিমাণ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ- /না/, /হা/ প্রভৃতি মুক্তাক্ষর স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে তা-ই একমাত্রা।

মাত্রাচিহ্ন– একমাত্রা নির্দেশ করার জন্য একটা (।) চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেতেহু মুক্তাক্ষর সর্বদাই একমাত্রা সেহেতু মুক্তাক্ষরের উপরের এই চিহ্ন বসানো উচিত। যেমন–

। । ।
/হা/, /না/, /সু/ ইত্যাদি।

আবার বদ্ধাক্ষর কখনো একমাত্রা কখনো দুমাত্রার বলে বদ্ধাক্ষরে (–) চিহ্ন ব্যবহার সুবিধাজনক। যেমন–

/হাড়্/, /থাক্/, /দিন্/ ইত্যাদি।

এভাবে চিহ্নিত করবার পর ছন্দের প্রকৃতি অনুসারে বদ্ধাক্ষরটি একমাত্রার হলে (।) এভাবে এবং দুমাত্রার হলে (।।) একভাবে নির্দেশ করা উচিত। যেমন- শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা লক্ষ্য করুণ/বন্ধুর/শব্দটিতে দুটি বদ্ধাক্ষর আছে - বন্ ধুর, সুতরাং এই শব্দটি এভাবে চিহ্নিত করা উচিত - বন্ধুর। অতঃপর ছন্দের প্রকৃতি অনুসারে-

। ।
ক. স্বরবৃত্ত হলে - বন্ধুর অর্থাৎ
দু'মাত্রা

।। ।।
খ. মাত্রাবৃত্ত হলে - বন্ধুর অর্থাৎ চারমাত্রা

। ।।
গ. অক্ষরবৃত্ত হলে - বন্ধুর অর্থাৎ তিন মাত্রা - এই ভাবে নির্দেশ করা উচিত।

যতি

বস্তুত কবিতা আবৃত্তি করবার সময় স্বাভাবিকভাবে যে স্থানে উচ্চারণ বিরতি ঘটে তাকে যতি বলে। শিক্ষার্থীবৃন্দ 'যতি' পরিভাষাটি ভালভাবে উপলব্ধির সুবিধার্থে উদাহরণের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে–

ক. অচ্ছোদ সরসীনীরে/রমনী যেদিন
নামিল স্নানের তরে/বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল/ভুবন ব্যাপিয়া

প্রথম প্রেমের মত/কাঁপিয়া কাঁপিয়া

খ. কেন এত ফুল/তুলিলি, সজনি/
ভরিয়া ডালা
মেঘাবৃত হলে/পরে কি রজনী।
তারার মালা?

গ. নীলের কোলে/শ্যামল সে দ্বীপ/প্রবাল দিয়ে/ঘেরা,
শৈলচূড়ায়/নীড় বেঁধেছে/সাগর বিহঙ্/গেরা।
নারিকেলের/শাখে শাখে/ঝোড়ো বাতাস/কেবল ডাকে।

উদ্ধৃতাংশগুলি আবৃত্তি করবার সময় (।) চিহ্নিত স্থানে স্বাভাবিকভাবে বিরতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। বাংলা ছন্দের আলোচনায় যতি নির্দেশ করবার জন্য (।) চিহ্নের ব্যবহার সুপরিচিত।

পাঠ- ২ ঃ পংক্তি, পর্ব, প্রস্বর ও স্তবকের সম্পর্কিত সংজ্ঞার্থ।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- পংক্তি, পর্ব, প্রস্বর ও স্তবকের সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- পংক্তি, পর্ব, প্রস্বর ও স্তবকের শ্রেণীবিন্যাসের পাশাপাশি এদের উদাহরণও সনাক্ত করতে পারবেন।

পংক্তি

সংজ্ঞার্থ- কবিতার এক একটা লাইন বা ছত্রকে সাধারণত পংক্তি বা চরণ নামে অভিহিত করা যায়। যেমনঃ /অচ্ছোদসরসী নীরে রমনী যেদিন/-এটি একটি পংক্তি বা চরণ। তবে কখনো কখনো একটি কাব্যপংক্তি দু'লাইনেও সাজানো হয়ে থাকে। যেমন-

।। ।। ।। ।।। ।।। ।।। ।।
কেন এত ফুল / তুলিলি, সজনি / ভরিয়া ডালা

এই কাব্যাংশটি দুই লাইনে লিখিত হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে একটি পংক্তি বা চরণ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "লেখার পংক্তি ও ছন্দের পদ এক নয়। আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড়া আছে বলে আমরা প্রয়োজনমতো পা মুড়ে বসতে পারি; তৎসত্ত্বেও গণনায় ওটাকে পা বলেই স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি। নইলে চতুষ্পদের কোঠায় পড়তে হয়। ছন্দও ঠিক তাই।"

পর্ব

সংজ্ঞার্থ- পংক্তির শুরু থেকে যতিচিহ্ন পর্যন্ত অথবা এক যতিচিহ্ন থেকে পরবর্তী যতিচিহ্ন পর্যন্ত কাব্যাংশকে পর্ব বলা হয়। যেমন–

।।। ।। ।। । । ।। ।। ।।
নীলের কোলে / শ্যামল সে দ্বীপ / প্রবাল দিয়ে ঘেরা

।। ।। । ।।। ।। ।। ।।
শৈল চূড়ায় / নীড় বেঁধেছে / সাগর বিহঙ্ / গেরা

এখানে /নীলের কোলে/, /শ্যামল সে দ্বীপ/, /প্রবাল দিয়ে/, /শৈল চূড়ায়/, /নীড় বেঁধেছে/ ও /সাগর বিহঙ্/ এক একটি পর্ব। প্রতি পর্বে চারটি করে মাত্রা আছে। শিক্ষার্থীবৃন্দ পর্ব সম্পর্কে পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি অপূর্ণ পর্ব ও অতিপর্ব সম্পর্কে পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি অপূর্ণ পর্ব ও অতিপর্ব সম্পর্কেও জানা উচিত।

অপূর্ণ পর্ব - পর্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র মাপের যে কাব্যাংশ চারণের শেষে বসান থাকে তাকে অপূর্ণ পর্ব বলে। যেহেতু এই চরণাংশটি একটি পূর্ণপর্বের সমমাপের নয়, তাই একে এ নামে ডাকা হয়, উপরের উদ্ধৃতাংশে /ঘেরা/ ও /গেরা/ অপূর্ণ পর্ব।

অতি পর্ব - কখনো পংক্তি বা চরণের প্রথমে পূর্ণ পর্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র মাপের কাব্যাংশ থাকে, তাকে অতিপর্ব বলে। যেমন–

।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।।
আমি / যুগে যুগে আসি / আসিয়াছি পুনঃ / মহাবিপ্লব / হেতু

এখানে চরণের প্রথমে, পূর্ণ পর্ব শুরু হবার আগে, পূর্ণ পর্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্রমাপে বাক্যাংশ /আমি/ হচ্ছে অতিপর্ব।

প্রস্বর (accent)

সংজ্ঞার্থ- কবিতা আবৃত্তি করবার সময় চরণ বা পংক্তির কোন কোন অক্ষর (syllable) অন্য অক্ষরের তুলনার প্রস্বরিত হয়। একে বলা হয় প্রস্বর (accent)। তবে কোন কোন ছান্দসিক একে ঝোঁক, বল, স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত নামেও অভিহিত করেছেন। উদাহরণ- এখন যারা/বর্তমান/আছেন মর্ত/লোকে সাধারণত স্বরবৃত্ত ছন্দেই প্রস্বরের প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়।

স্তবক (stanza)

সংজ্ঞার্থ— কবিতার ভাব প্রকাশের সুবিধার্থে কবি কখনো কখনো তাঁর কবিতা বিশিষ্ট ভঙ্গি চরণগুলো সজ্জিত করেন। এই ধরনের চরণগুচ্ছকে স্তবক (stanza) বলে। বাংলা কবিতায় মূলত মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' থেকেই স্তবকবিন্যাসরীতি বৈচিত্র্য প্রচলিত হয়। যেমন-

কেন এত ফুল তুলিলি, সজনি–
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের মালা?

এখানে–

৬ । ৬
৫
৬ । ৬
৫
৬ । ৬
৫

এই ভঙ্গিতে কবি স্তবক বিন্যাস করেছেন এবং এই ধরনের ৬টি স্তবক রচনা করে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' '৮ কুসুম, শীর্ষক অংশটি লিখেছেন।

ইউনিট- ২

ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য

ভূমিকা

বাংলা কাব্য ইতিহাসের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় প্রধানত স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত - এই তিন ধরনের ছন্দের অস্তিত্ব লক্ষ্যযোগ্য। বাংলা কবিতার এই তিনটি ছন্দের পঠনরীতির ভিন্নতার পাশাপাশি এদের বহুলাংশে চরিত্রগত ব্যবধানও আছে। অর্থাৎ এরা কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সহযোগে বাংলা কবিতায় স্বরূপে অস্তিত্বশীল। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই ইউনিটটিকে নিম্নোক্ত দুটি পাঠে বিন্যস্ত করতে পারি।

পাঠ- ১ ঃ পঠনরীতির ভিন্নতা সহযোগে ছন্দ পার্থক্য সনাক্ত করণ
পাঠ- ২ ঃ স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ- ১ ঃ পঠনরীতির ভিন্নতা সহযোগে ছন্দ-পার্থক্য সনাক্তকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- পঠনরীতির মাধ্যমে তিন ছন্দের পার্থক্য ধরতে পারবেন।
- তিন শ্রেণীর ছন্দের গতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত হবার জন্যে আমরা প্রথমে কাব্যাংশ উপস্থাপন করছি।

১. স্বরবৃত্ত

।। ।। ।— ।। ।— ।। ।।
এসো দ্রুত / চরণ দুটি / তৃণের পরে / ফেলে

— ।। । ।—। — । । । । । । । —
ভয় করো না / অলক্ত রাগ / মোছে যদি / মুছিয়া যাক

।— । । । । । । । — । । । ।
নূপুর যদি / খুলে পড়ে / না হয় রেখে / এলে

২. মাত্রাবৃত্ত

। — । — । । । ।— — — । । —
ভূতের মতন / চেহারা যেমন / নির্বোধ অতি / ঘোর

। । । ।— —। ।— । —। ।— —
যা কিছু হারায় / গিন্নী বলেন / চেষ্টা বেটাই / চোর

৩. অক্ষরবৃত্ত

। ।—। । । । । । । । ।—
হে দারিদ্র্য তুমি মোরে / করেছ মহান

। । । । ।।।। — — — —
তুমি মোরে দানিয়াছ / খ্রীষ্টের সম্মান

—— । ।— । । । । । ।—
বন্টক - মুকুট শোভা / দিয়াছ তাপস

প্রিয় শিক্ষার্থী আপনারা নিশ্চয় খেয়াল করেছেন, উদ্ধৃত তিনটি অংশ একই ভঙ্গিতে পাঠ করা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। বস্তুত আবৃত্তিকালে প্রত্যেকটি কাব্যাংশের নিজস্ব ছন্দ দোলা বা লয় দিয়ে তার ছন্দ বৈশিষ্ট্য অবহিত হওয়া যায় এবং এই ছন্দদোলার স্বাতন্ত্র্য প্রকৃতপক্ষে উদ্ধৃত কাব্যাংশ তিনটির বক্তব্যের স্বাতন্ত্র্যের প্রতিও ইঙ্গিত করে।

আমরা খেয়াল করব, প্রথম উদ্ধৃতিতে করি 'চিরায়মানার' সাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং তিনি তাঁর ক্ষণিকাকে দ্রুতলয়ে আহ্বান করেছেন। কবিতাটির চরণে চরণে তাই সেই দ্রুতলয়ের দোলা। ফলে স্বরবৃত্তের কবিতাংশ।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে কবি বলছেন তাঁর পুরাতন ভৃত্যের কথা। এখানে গিন্নী ক্রুদ্ধ হলে কবি নন; বরং 'নির্বোধ পুরাতন ভৃত্য সম্পর্কে একটা প্রশ্রয়ের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তার ব্যস্ততাবিহীন বলবার ভঙ্গিতে। এই কাব্যাংশে তাই পূর্বের অংশের মত দ্রুত লয় নেই। তবে এখানেও একটি নিজস্ব ছন্দদোলা আছে এবং এটি পড়তে হয় একটু টেনে টেনে, অপেক্ষাকৃত ধীরলয়ে। ফলে এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাংশ।

তৃতীয় উদ্ধৃটিটি কবির জীবন প্রত্যয়ের বানীরূপ। এখানে প্রথম উদ্ধৃতির লঘুক্তির দ্রুতলয় নেই, নেই দ্বিতীয় কাব্যাংশের প্রশ্রয়জাত ধীরলয়। কবির উদাত্ত ঘোষণা এখানে সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের ছন্দভঙ্গি সৃষ্টি করছে। ফলে কবিতাটি পড়তে হচ্ছে অনেকটা ঋজু ভঙ্গিতে। আর এই ভঙ্গি আমাদের স্বাভাবিক ভঙ্গির সন্নিকট বলে, এটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতার উদাহরণ।

সর্বোপরি, শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কবি বক্তব্য অনুসারে তাঁর কবিতার ছন্দ নির্বাচন করে থাকেন এবং ছন্দ, অলঙ্কারে কবিতার বক্তব্য সম্পূর্ণ কারুকার্যমন্ডিত হয়ে উঠে। ফলে আবৃত্তির মাধ্যমে সৃষ্ট ছন্দদোলার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ছন্দের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার পাশাপাশি এর লয়কেও সনাক্তকরা সম্ভব।

পাঠ- ২ ঃ স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- তিন প্রকার ছন্দের স্বাতন্ত্র্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- তিন প্রকার ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।

পঠনরীতির ভিন্নতা একশ্রেণীর ছন্দ থেকে অন্য শ্রেণীর ছন্দকে যেমন আলাদা করে চিনিয়ে দেয়, তেমনি স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত-এই তিন শ্রেণীর ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন স্বাতন্ত্র্য চারিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সর্বদাই নির্দেশযোগ্য ও পর্যবেক্ষণ সাধ্য। আবার স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই দুই ছন্দের বৈশিষ্ট্যসমূহ পঠনরীতির ভিন্নতা সত্ত্বেও গতির দিক থেকে অধিকতর কাছাকাছি বলে এদের পার্থক্য অনুধাবনও জরুরি। প্রথমে নিম্নে এ দুটি ছন্দের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো–

স্বরবৃত্ত

— । । । । । । । —। । । । ।
খেদ করো না / মালা হতে / মুক্তা খসে / গেলে

। । । । ।— ।। ।— । । । ।
এসো দ্রুত / চরণ দুটি / তৃণের পরে / ফেলে

মাত্রাবৃত্ত

।— ।— । । । ।— —— । । —
ভূতের মতন / চেহারা যেমন / নির্বোধ অতি / ঘোর

। । । ।— —। ।— —। ।— —
যা কিছু হারায় / গিন্নী বলেন / কেষ্টা বেটাই / চোর /

প্রিয় শিক্ষার্থী, লক্ষ্য করবেন দুটি কাব্যাংশ্যই সমিল চরণে গঠিত এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেক চরণে তিন পূর্ণ পর্ব ও একটি করে অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। তবে পার্থক্য এই যে স্বরবৃত্তের পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার ও মাত্রাবৃত্তের পূর্ণ পর্বের মাত্র সংখ্যা ছয়। ফলে উদ্ধৃতাংশ

দুটিতে স্বরবৃত্ত ছন্দের তিনটি পূর্ণ পর্ব যেখানে মোট ১২ মাত্রা সেখানে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পূর্ণপর্বে মোট মাত্রাসংখ্যা ১৮। সুতরাং মাত্রাবৃত্ত কাব্যাংশটি পাঠনকালে স্বরবৃত্ত কাব্যাংশটির তুলনায় দীর্ঘতর সময় প্রয়োজন।
ফলে, উদ্ধৃতাংশ দুটির ছন্দদোলায় চিত্র হবে নিম্নরূপ।

স্বরবৃত্ত

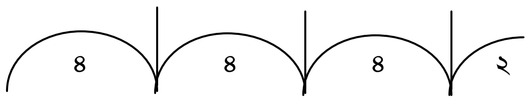

মাত্রাবৃত্ত

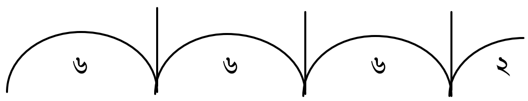

উদ্ধৃতি দুটির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করতে পারি।

- স্বরবৃত্ত ছন্দে সুনির্দিষ্ট ছন্দদোল তুলনামূলক ভাবে দ্রুত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অপেক্ষাকৃত ধীর অর্থাৎ মধ্যলয়ের।
- ছন্দদোলার দ্রুতলয়ের জন্য স্বরবৃত্তের বদ্ধাক্ষর একমাত্রার হয়; এবং ছন্দদোলার মধ্যলয়ের জন্য মাত্রাবৃত্তে বদ্ধাক্ষর হয় দুই মাত্রা।
- স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই দুই শ্রেণীর ছন্দেই পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা সর্বদা সমান থাকে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের অনুরূপ ভঙ্গির ছন্দদোলা বর্তমান নেই। আবার এতে সমমাপের দুই বা ততোধিক পূর্ণপর্ব নূর্বোক্ত দুটি ছন্দের ভঙ্গিতে ব্যবহৃত হয় না। ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এ দুটি ছন্দ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্যক উপলব্ধির জন্য নিম্নে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

| | || | | | | | | | | ||
হে দারিদ্র্য তুমি মোরে / করেছ মহান

| | | | | | | | | | || | ||
তুমি মোরে দানিয়াছ / খ্রীষ্টের সম্মান

| || | || | | | | | | | ||
কন্টক মুকুট শোভা / দিয়াছ তাপস

উদ্ধৃতিটিতে প্রত্যেক চরণে দুটি পর্ব আছে। প্রথম পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৮ এবং দ্বিতীয় পঠের মাত্রা সংখ্যা ৬। ফলে এখানে নিম্নোক্ত ছন্দদোলার সৃষ্টি হয়েছে।

|
৮ ৬

শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, দ্বিতীয় পর্বের মাত্রা সংখ্যা প্রথম পর্বের মাত্রাসংখ্যা থেকে কম দেয়া সত্ত্বেও একে অপূর্ণ পর্ব বলা যাচ্ছে না বরং অসম মাত্রার দুটি চরণকেই পূর্ণপর্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কোন অপূর্ণপর্ব থাকে না। নিম্নের উদাহরণ থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

—| | | | | | | | | | | ||
চিহ্ন তব পড়ে আছে / তুমি হেথা নাই
| || | || | |
যে প্রেম সম্মুখ পানে

। । । । । । । । । ।
চলিতে চালাতে নাহি জানে
— — — — — — — — — —

। । । । । । । । । ।
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরিয়ে

এই উদ্ধৃতিতে ২.৪, ৬, এবং ১০ মাত্রার পূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে। এর কোনটিই অপূর্ণ পর্ব নয়। চরণে মাত্র দুটি মাত্রা আছে এবং এই দুই মাত্রা নিয়েই একটি পূর্ণ পর্ব ও সম্পূর্ণ চরণ গঠিত হয়েছে।

সুতরাং উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আমরা অক্ষর বৃত্ত ছন্দের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি।

- অক্ষরবৃত্ত ছন্দে স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মতো কোন সুনির্দিষ্ট ছন্দ দোলা সাধারণত যাকে না, অথবা এটি অপরিহার্যও নয়।
- এই ছন্দ আবৃত্তিকালে স্বাভাবিক উচ্চারণের ভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করে বলে বদ্ধাক্ষর শব্দের আদি বা মধ্যে এলে সাধারণত একমাত্রার এবং শব্দের শেষে এলে দুই মাত্রার হয়।
- বদ্ধাক্ষর উচ্চারণে কখনো এক, কখনো দুই মাত্রা হওয়ায় এবং পূর্ণ পর্বে মাত্রা সংখ্যা সাধারণত অসম হওয়ার এ ছন্দের আবৃত্তিতে স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের মতো দোলায়িত ভঙ্গি নয়, বরং এক ধরনের ঋজু ধ্বনিমালা সৃষ্টি হয় যা বহুলাংশে বাংলা স্বাভাবিক কথাবলা ভঙ্গির (Speech pattern) সন্নিকৃষ্ট।

বাংলা অলঙ্কার

ইউনিট- ১ ঃ অলঙ্কার ঃ সাধারণ আলোচনা

ভূমিকা

জন্মগতভাবে মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। সে নিজে যেমন সুন্দর হয়ে চলতে চায়, ঠিক তেমনি চায় যে অপরেও তার সামনে সুন্দর হয়ে চলুক। পাশাপাশি, কাব্য - যা মানুষের সৃষ্টিশীলতার আবেগময় প্রকাশ, তাকে ও অলঙ্কৃত ও সৌন্দর্যমন্ডিত করার প্রয়াস মানুষ আদিকাল থেকে চালিয়ে এসেছে। ফলে কাব্যভাবনায় 'অলঙ্কারের' ধারণাটি যেমন বিস্তার ও বিকাশ লাভ করেছে সংস্কৃতসহ বাংলা কবিতায়, তেমনি অন্যদেশেও।

অলঙ্কার প্রথম পর্যায়ে কেবল সৃষ্টিশীল কবিদের কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠলেও পরবর্তীতে তা তাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং গড়ে ওঠে সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্যসহ অলঙ্কার সম্পর্কিত নানা প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এই ইউনিটে অলঙ্কার ও এর স্বরূপ অনুসন্ধান সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা করব বলে এই ইউনিটটিকে নিম্নোক্ত একটি পাঠে বিন্যাস করতে পারি।

পাঠ- ১ ঃ অলঙ্কারের স্বরূপ, সংজ্ঞার্থ ও শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠের অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- অলঙ্কারের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- বাংলা অলঙ্কারের শ্রেণী বিভাগ করতে পারবেন।

বক্তব্যকে সরস ও সুন্দর, রমনীয় ও রসোত্তীর্ণ করে তোলার প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অলঙ্কার। শিক্ষার্থীবৃন্দ, মনে রাখবেন, অলঙ্কার আদৌ কোন বাইরের বস্তু বিশেষ নয় - শব্দেরই সরাসরি অন্তরের জিনিস। শিল্পী সাহিত্যিকের চিন্তা-ভাবনা রসোত্তীর্ণ রূপ পাওয়ার জন্য একই প্রয়াসে কাব্যের সঙ্গে অভিন্নভাবে অলঙ্কার জন্ম নিয়ে থাকে। আর এই অলঙ্কারের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতির জন্য কেউ কেউ অলঙ্কৃত বাক্যকেই কাব্য বলে থাকেন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে অনেকে অলঙ্কারকে কাব্যের প্রধান অঙ্গ বলে ভাবতেন। প্রাচীন আলঙ্কারিক দন্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে বলেছেন 'কাব্য শোভা করান ধর্ম্মান অলঙ্কারান প্রচক্ষতে।' অর্থাৎ কাব্যের যে সমস্ত ধর্ম তার শোভা সম্পাদন করে তাইই হচ্ছে অলঙ্কার। বামনের মতে - 'কাব্যম গ্রাহ্যম অলঙ্কারাৎ' -অর্থাৎ অলঙ্কারের জন্যই কাব্য কাব্য বলে বিবেচিত। আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন বলেন - 'অলঙ্কারেহি চারুত্বহেতু' -অর্থাৎ চারুত্ব সম্পাদনের জন্য অলঙ্কারের আবশ্যকতা। তবে ভারতীয় প্রাচীন অলঙ্কারিকেরা কাব্যদেহকে যে নারীদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন তা অলঙ্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে সবসময় যথার্থ অর্থে সঠিক, সুন্দর, সুসঙ্গত নয়। কেননা নারীদেহের অলঙ্কার তার দেহের অতিরিক্ত বাইরের বস্তু বিশেষ। ইচ্ছে মত তাকে খোলা বা পরা যায়। কিন্তু কাব্যদেহের অলঙ্কার তা নয় - তাই তাকে ইচ্ছামত খোলা বা পরার প্রশ্নই ওঠে না। কাব্যদেহের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রিয় শিক্ষার্থী, উপরে অলঙ্কারের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার আমরা তারই আলোকে অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ প্রদান করব।

বক্তব্যের ভাষাদেহকে সামগ্রিক সৌন্দর্যে সরস ও সুষমামন্ডিত, ললিত ও লাবণ্যময় করে তোলার জন্য কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টিকর্মে যে সমস্ত রূপারোপের বিশেষ বস্তু প্রয়োগ করেন তাদেরকেই অলঙ্কার বলে।

অলঙ্কার মূলত কাব্যের বাক্যকে আশ্রয় করেই আবর্তিত। অর্থাৎ বাক্যের শব্দ ও অর্থ-এই দুই দিকের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে অলঙ্কার। বাক্যের শব্দের ধ্বনিরূপ যেমন আমাদের কর্ণগোচর হয়, তেমনি অর্থরূপ আমাদের মনোগোচর হয়। সুন্দর, সামাঞ্জস্যপূর্ণ ও সুমধুর ধ্বনিবিন্যাস আমাদের কানকে মুগ্ধ করার পাশাপাশি অর্থের অপূর্ব ব্যঞ্জনাও আমাদের মনকে মন্ত্র-মুগ্ধ করে তোলে। তাই বাক্যকে অলঙ্কৃত করার অর্থ আসলে বাক্যস্থ শব্দের ধ্বনিরূপ ও অর্থরূপকে অলঙ্কৃত করা। ফলে আমরা সংস্কৃতসহ বাংলা অলঙ্কারশাস্ত্রে দুই ধরনের অলঙ্কার পাই। যথা- ১. শব্দালঙ্কার ২. অর্থালঙ্কার।

ইউনিট- ২ ঃ শব্দালঙ্কার

ভূমিকা

শব্দের উচ্চারণ ঘটে থাকে ধ্বনির আশ্রয়ে। সেই ধ্বনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যে অলঙ্কার তার নাম শব্দালঙ্কার। অন্যকথায় - শব্দের ধ্বনিরূপকে আশ্রয় করে যে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তার নাম শব্দালঙ্কার।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, মনে রাখতে হবে, বাক্যের শব্দকে ঘিরেই শব্দালঙ্কারের সৃষ্টি। এর মূল মাধুর্যটুকু নিহিত থাকে শব্দের এই ধ্বনিরূপেই। তাই শব্দকে বা তার বিশেষ ধ্বনিরূপকে বদলে দিলে তার অলঙ্কারও সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। অন্যকথায় শব্দালঙ্কার শব্দেরই বিশিষ্ট অলঙ্কার তাই শব্দের পরিবর্তন সে সহ্য করতে পারে না। অন্য দিকে অর্থালঙ্কারের অর্থ ঠিকমত বজায় রেখে শব্দকে ইচ্ছে মত বদলে নেওয়া যায় - তাতে অলঙ্কারের কোন পার্থক্য হয় না।

শব্দালঙ্কারে সংখ্যা অধিক হলেও বাংলাভাষার ব্যবহারিক উপযোগিতার কথা লক্ষ্য রেখে একে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- ১. অনুপ্রাস ২. যমক ৩. বক্রোক্তি ৪. শ্লেষ। ফলে উপরি-উক্ত শব্দালঙ্কারগুলো আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে নিম্নোক্ত চারটি পাঠে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন–

পাঠ- ১ ঃ অনুপ্রাস ও এর শ্রেণীবিভাগ
পাঠ- ২ ঃ যমক ও এর শ্রেণীবিভাগ
পাঠ- ৩ ঃ বক্রোক্তি ও এর শ্রেণীবিভাগ
পাঠ- ৪ ঃ শ্লেষ

পাঠ- ১ ঃ অনুপ্রাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- অনুপ্রাসের রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- অনুপ্রাসের সংজ্ঞার্থ প্রদান করতে পারবেন।
- অনুপ্রাসের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- বাক্যে অনুপ্রাস অলঙ্কার শনাক্ত করতে পারবেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী, 'অনুপ্রাস' শব্দের 'অনু' শব্দের অর্থ 'পরে' বা 'পিছনে' আর 'প্রাস' শব্দের অর্থ 'বিন্যাস' 'প্রয়োগ' বা 'নিক্ষেপ'। তাহলে 'অনুপ্রাস' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় - পরে প্রয়োগ। অর্থাৎ একটি শব্দে ব্যবহৃত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে পরের বা পিছনের শব্দে একইভাবে ব্যবহারের নাম অনুপ্রাস। মূলত: বিশেষ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ এইভাবে এক একটি শব্দে বার বার ব্যবহারের ফলে একটি সুন্দর ধ্বনি সাম্যের সৃষ্টি হয় এবং কানের কাছেও মধুর মনে হয়। ধ্বনিগত এই বিশেষ সুষমা বা সৌন্দর্যের জন্যই অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। অনুপ্রাস অলঙ্কারে বারবার ব্যবহৃত একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ শব্দ একটি থেকে আরেকটি খুব দূরে বসে না, বসে যথাসম্ভব পরে, পিছনে বা কাছাকাছি। এই কারণে অদূরতাই অনুপ্রাস অলঙ্কারে অন্যতম লক্ষণ। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই আলোচনার পর অনুপ্রাসের যে সব বৈশিষ্ট্য পাই সেগুলি হচ্ছে–

১. এতে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়।
২. একাধিকবার ব্যবহৃত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছযুক্ত শব্দগুলো যথাসম্ভব পরপর বা কাছাকাছি বসে।
৩. এর ফলে সৃষ্টি হয় অনিন্দ্য সুন্দর ধ্বনি সৌন্দর্য।

উপরের এই বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে আমরা যদি অনুপ্রাসের সংজ্ঞার্থ প্রদান করি তাহলে তা নিম্নোক্ত ভাবে বলা যায়। অর্থাৎ একই ধ্বনি বা ধ্বনি গুচ্ছের একাধিখবার ব্যবহারের ফলে যে সুন্দর ধ্বনি সাম্যের সৃষ্টি হয় তার নাম অনুপ্রাস। প্রিয় শিক্ষার্থী, অনুপ্রাসের উপরি-উক্ত সংজ্ঞার্থ জানার পর তার বাস্তবপ্রয়োগ বাক্যে কিভাবে হয়েছে, তা জানার জন্য আমরা কতিপয় উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি। যেমন–

১. তাপিত তনয়ে তব তারহ তারিনী —— ভারতচন্দ্র।
 – এখানে 'ত' ধ্বনির ছ'বার পুনরাবৃত্তিতে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে।

২. কুশল কামনা কর কুসঙ্গ করিয়া —— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
 – এখানে 'ক' ধ্বনির পাঁচবার পরপর বা কাছাকাছি বসার কারণে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে।

৩. চল চপলার চকিত চরণে করিছ চরণ বিচরণ —— রবীন্দ্রনাথ।

— এখানে 'চ' ধ্বনি পরপর বা কাছাকাছি শব্দে 'ছ' বার প্রয়োগের কারণে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে।

শ্রেণীবিভাগ

অনুপ্রাস অলঙ্কারের উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও সংজ্ঞার্থের আলোকে আমরা যদি আরেকটু গভীর বিশ্লেষণে মনোযোগী হই, তবে এই অলঙ্কারের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ পাই। যথা– ১. অন্ত্যানুপ্রাস ২. বৃত্ত্যনুপ্রাস ৩. ছেকানুপ্রাস

১. অন্ত্যানুপ্রাস ঃ কবিতার চরণের শেষে বা অন্তে অবস্থিত বলেই এ ধরনের অনুপ্রাসের নাম অন্ত্যানুপ্রাস। শব্দধ্বনির মিত্রতা বা মিল যাকে বলে এর অন্য নাম মিত্রাক্ষর বা মিল। উপরি - উক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এর সংজ্ঞার্থ হচ্ছে - কবিতার দুটি চরণের শেষে যে শব্দধ্বনির মিল থাকে তারই নাম অন্ত্যানুপ্রাস। উদাহরণ- ১. এতদিনে বুঝিলাম এ হৃদয় মরু না ঋতুপতি তার প্রতি আজো করে করুণা —— রবীন্দ্রনাথ

— 'মরু না' ও 'করুণা' মিলে অন্ত্যানুপ্রাস হয়েছে।

২. আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে বাঁচতে যদি চাও
তেতুঁল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
— চরণের শেষে 'চাও' এর সঙ্গে 'খাও' -এর মিলনে অন্ত্যানুপ্রাস হয়েছে।

৩. **বৃত্ত্যনুপ্রাস - সংজ্ঞার্থ ঃ** একটি ব্যঞ্জন ধ্বনি একাধিকবার ধ্বনিত হলে, বর্ণগুচ্ছ স্বরূপ বা ক্রমানুসারে যুক্ত বা বিযুক্তভাবে বহুবার ধ্বনিত হলে যে অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয় তার নাম বৃত্ত্যনুপ্রাস। অর্থাৎ এতে একটি একক ব্যঞ্জন ধ্বনি যেমন ব্যবহৃত হতে পারে ঠিক তেমনি পারে একাধিক ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছও।

প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনাদের সুবিধার জন্য উদাহরণ উল্লেখ করা হল–

১. তাজা তাজা তরকারি তাতে নেটো বেলে। –ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত – এখানে একক ব্যঞ্জন 'ত' ধ্বনির চারবার পুনরাবৃত্তিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে

২. কেতকী কেশরে কেশ পাশ করো সুরভি রবীন্দ্রনাথ—— এখানে একক ব্যঞ্জন 'ক' পাঁচবার – 'শ' – ও – 'র' – পরপর তিনবার পুনরাবৃত্ত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে।

৩. ছেকানুপ্রাস ঃ সংজ্ঞার্থ - দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জন ধ্বনি যুক্ত বা বিযুক্তভাবে একই ক্রমে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হলে যে অলঙ্কার হয় তার নাম ছেকানুপ্রাস। অর্থাৎ, মনে রাখতে হবে যে, একক ব্যঞ্জনে কোনক্রমেই ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার হয় না। সংযুক্ত ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছ সবসময় তাতে থাকতেই হবে। উদাহরণ——

১. লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা-অস্তাচলে। মধুসূদন—— এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন 'ঙ্ক' ক্রমানুসারে মাত্র দুবার ধ্বনিত হওয়ায় ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে।

২. করিয়াছ পান চুম্বন ভরা সরস বিম্বাধারে। রবীন্দ্রনাথ – এখানে 'ম্ব' যুক্তব্যঞ্জন ক্রমানুসারে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হওয়ায় এই অলঙ্কার হয়েছে।

ইউনিট- ৩ ঃ অর্থালঙ্কার

ভূমিকা

অর্থালঙ্কার অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অর্থালঙ্কার যেহেতু বক্তব্যকে আরো সরস ও সুন্দর, সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী, পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষ করে, তাই এই অলঙ্কার ভালভাবে বুঝার জন্য এর সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ আলোচনা প্রয়োজন। নিম্নে এর সংজ্ঞার্থ প্রদান করা হল।

সংজ্ঞার্থ- একান্তভাবে শব্দের অর্থরূপের আশ্রয়ে যে অলঙ্কার গড়ে ওঠে তার নাম অর্থালঙ্কর। অর্থাৎ, অর্থকে যথাযথভাবে বজায় রেখে শব্দকে খেয়াল খুশীমত বদলে দিলে এর আদৌ কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় না। অন্যভাবে বলতে গেলে — অর্থালঙ্কারে অর্থই আসল — শব্দ নয়।

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্থালঙ্কারের সংখ্যা প্রকৃত অর্থে অনেক বেশি হলেও সাধারণ লক্ষণ ও বহুল ব্যবহার অনুযায়ী এদেরকে ১. সাদৃশ্যমূলক ২. বিরোধমূলক ৩. শৃঙ্খলামূলক ৪. ন্যায়মূলক ৫. গূঢ়ার্থমূলক — এই পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। তাই আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই ইউনিটটিকে নিম্নোক্ত পাঁচটি পাঠে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা–

পাঠ- ১ ঃ সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার ও এর শ্রেণীবিভাগ
পাঠ- ২ ঃ বিরোধমূলক অলঙ্কার ও এর শ্রেণীবিভাগ
পাঠ- ৩ ঃ শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার ও এর শ্রেণীবিভাগ
পাঠ- ৪ ঃ ন্যায়মূলক অলঙ্কার ও এর শ্রেণীবিভাগ
পাঠ- ৫ ঃ গূঢ়ার্থমূলক অলঙ্কার ও এর শ্রেণীবিভাগ

পাঠ- ১ ঃ সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার ও এর শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ প্রদান করতে পারবেন।
- সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের শ্রেণীবিভাগ করতে করতে পারবেন।
- বাক্যে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারে পরিভাষাসমূহ সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনারা জানেন যে, কবি বা সাহিত্যিক কখনো কখনো সাহিত্য রচনার সময় বাক্যকে অলঙ্কৃত করার জন্য একটি বস্তুর সঙ্গে আরেকটি বস্তুর তুলনা প্রদান করেন। বস্তুত, আকারে প্রকারে তারা যতই পরস্পর পৃথক হোক না কেন, কবি তাঁর প্রতিভা দক্ষতায় তাঁদের মধ্যে বর্তমান এমন একটি স্বরূপ সাদৃশ্য উদ্ভাবন করেন যা সেই দুটি বিজাতীয় বস্তুকে একটি অভিন্ন সাম্যসূত্রে গ্রথিত করে ফেলে। আবার তাদের বৈসাদৃশ্য যত বেশি হবে তাদের অলঙ্কারও ততবেশি বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্যে মধুর হয়ে উঠবে। যেমন- চোখের সঙ্গে চোখের তুলনা বা সাদৃশ্য হয় না। কিন্তু চোখের সঙ্গে পদ্ম-পলাশের তুলনায় অপরূপ অলঙ্কার হয়। যেহেতু সরল অর্থে তারা পরস্পর বিসদৃশ ও অসম তাই তাদের মাঝে সাদৃশ্য পাঠককে উদ্দীপ্ত ও অভিভূত করে তোলে। আর একে কেন্দ্র করেই সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার হয়। উপরের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিম্নে এর সংজ্ঞার্থ প্রদান করা হল–

সংজ্ঞার্থ– দুটি বিশেষ বিজাতীয় বা বিসদৃশ বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বরূপ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যে অলঙ্কার গড়ে ওঠে তার নাম সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনাদের মনে রাখতে হবে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারে বিজাতীয় বস্তুদুটির অন্তনির্হিত সাদৃশ্য হয় গুণগত, ক্রিয়াগত কিংবা গুণ ও ক্রিয়ার নানাভাবের মিশ্রণজাত কর্মের ভিত্তিতে।

আবার, এই অলঙ্কার গড়ে ওঠে চারটি বিশিষ্ট অঙ্গের আশ্রয়ে। এগুলি হচ্ছে–
১. উপমেয় ২. উপমান ৩. সাধারণ ধর্ম ৪. তুলনাবাচক শব্দ।

নিম্নে এই অলঙ্কার এই চারটি অঙ্গ সম্পর্কিত পরিভাষাসমূহ উল্লেখ করা হল।

১. **উপমেয় ঃ** দুটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হলে যাকে তুলনা করা হয় তার নাম উপমেয়।
২. **উপমান ঃ** যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তার নাম উপমান।
৩. **সাধারণ ধর্ম ঃ** দুটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যে বিশেষ গুণ, মিল বা সাধারণ সাদৃশ্যের জন্য তুলনা করা হয় তার নাম সাধারণ ধর্ম।
৪. **তুলনাবাচক শব্দ ঃ** ন্যায়, মত, সদৃশ প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দের সাহায্যে তুলনা করা হয় তার নাম তুলনাবাচক শব্দ।

প্রিয় শিক্ষার্থী, নিশ্চয়ই এই চারটি পরিভাষার সংজ্ঞার্থ জেনেই এদের সম্পর্কে আপনাদের পরিপূর্ণ ধারণা জন্মাচ্ছে না। তাই বিষয়গুলির আর স্বচ্ছ ধারণার জন্য আমরা নিম্নোক্ত উদাহরণ উল্লেখ করে বুঝানো যেতে পারে। যেমন- 'চন্দ্রের মত সুন্দর সখী হেরি তব মুখখানি'। এখানে 'মুখ'কে তুলনা করা হচ্ছে তাই এটি উপমেয়।
'চন্দ্রের' সঙ্গে মুখের তুলনা হচ্ছে, তাই চন্দ্র — উপমান।

'সুন্দর' যেহেতু 'মুখ' ও 'চন্দ্র' উভয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ। তাই 'সুন্দর' হচ্ছে সাধারণ ধর্ম। আর 'মত' হচ্ছে তুলনাবাচক শব্দ। কেননা এই শব্দের সাহায্যেই তুলনা করা হয়েছে। সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের শ্রেণীবিভাগ ঃ সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের শ্রেণীবিভাগ ঃ সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের সংখ্যা অনেক। তবে এদের মধ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, নিশ্চয়, অপহ্নুতি, রূপক, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি ইত্যাদি প্রধান।